শ্রীসারদা-গ্রন্থমালা—১

কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম
কুমারখালী, নদীয়া

আশ্বিন ১৩৫০ সাল

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

অধ্যক্ষ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম

কুমারখালী, নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। পি. সি. চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদাস

৭৪, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা

৮৫নং আপার সারকুলার রোড, 'ভারতমিহির যন্ত্রে'

শ্রীযুগলচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁহার কৃপায়

কিঞ্চিৎ বিবেক-বৈরাগ্য লাভে

ধন্য হইয়াছি ;

তাঁহার এই উপদেশ,

তাঁহারই করকমলে

"গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা"র

ন্যায়

ভক্তি সহকারে

অর্পিত হইল।

নিবেদন

মহাপুরুষদিগের জীবন এবং উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। তন্মধ্যে যাঁহারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহাদের জীবনের কঠোর তপস্যাদি লোকচক্ষুর অন্তরালেই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, এই সকল জানিবার কোন উপায় নাই। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট দিবসের মধ্যে নানা ভাবের বহু লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করিত এবং নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করিয়া লইত। সামান্য দু-এক ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গ করিয়া কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার উপদেশ শ্রবণান্তর যতটুকু নিজের জন্য লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাই ভক্তগণের আগ্রহে এবং বেলুড়মঠের শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজের ঐকান্তিক উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। একই সমস্যার সমাধান করিতে পূজনীয় স্বামিজী বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রশ্নকারীর ভাবানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেন, কাজেই একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নহে।

কলিকাতায় অবস্থানকালে স্বামিজী মহারাজের নিকট প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু লোক-সমাগম হইত। এত সব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে একটুও বিরক্তি বোধ করিতেন না। রাত্রি এগার-বার ঘটিকা পর্যন্তও স্থির ধীরভাবে বসিয়া সমিতির কাজ, ভক্তদের পত্রাদির উত্তর দেওয়া, তদুপরি পড়াশুনা করিতে কতদিন তাঁহাকে দেখিয়াছি।

ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর তাঁহার পূত সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ যতটুকু জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এই পুস্তকের উপাদান। এই পুস্তকে তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর কথঞ্চিৎ সন্নিবেশিত হইল মাত্র; ইহাতে যদি একজনেরও কল্যাণ সাধিত হয়, তবে শ্রম সার্থক হইবে। পরিশিষ্টে স্বামিজীর নিজ হস্তে লিখিত কয়েকখানি পত্রের নকল দেওয়া হইল। ইহাতেও ভক্তদের কল্যাণ হইবে আশা করি।

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধনাদি করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এবং শ্রীমৎ স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ মহারাজ পুস্তকের মুদ্রিত অনুলিপির সংশোধন বিষয়ে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

যাঁহাদের সাহায্যে ও প্রচেষ্টায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি।

আশ্বিন, মহাষ্টমী
১৩৫০

গ্রন্থকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবে দেশে এক নবযুগের প্রবৃত্তি হয়। পূর্বে যাঁহাদের সাধনায় ইহার বৈশিষ্ট্য ঘটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামী শ্রীঅভেদানন্দজি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ভারতের গৌরব। কিছুকাল হইল তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন বা দান করিয়া গিয়াছেন তাহা "বহুজনহিতায়" থাকিবে বহুকাল। তিনি নানা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য ও ভক্তগণকে নানা উপদেশ দিতেন। তাঁহার শিষ্য, এই গ্রন্থকার, স্বামী শ্রীসোমেশ্বরানন্দজি তাহার কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ ইনি তাহাই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে স্বর্গীয় স্বামীজির কথা-বার্তা বা আলাপ-সালাপের মধ্যে সাধ্য-সাধন বা ভজন-উপাসনা সম্বন্ধে অতি সহজ ও সরলভাবে এরূপ বিবিধ আলোচনা করা হইয়াছে যাহাতে এই বিষয়ে অনুরাগী পাঠকগণ প্রভূত উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

"ব্রহ্মবিহার",
কলিকাতা,
১৫ই আশ্বিন, ১৩৫০।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

পরিচয়

যুগ-প্রবর্তক জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অন্যতম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার লীলা ও লোককল্যাণসাধনার্থ যে কয়েকজন নিত্য-মুক্ত মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জগৎপূজ্য সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক যুগেই অবতারগণ জীবকল্যাণসাধনকল্পে বিশেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ষদদিগকে সঙ্গে লইয়া আবির্ভূত হন। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণাবতারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই তিনি সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ ১২৭৩ সালে ১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ইংরাজী ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণানবমী তিথিতে রাত্রি দশঘটিকার সময় কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় রসিকলাল চন্দ্র, মাতা নয়নতারা দেবী।

রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং শিক্ষকতায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ও অশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনি ধার্মিক, পরোপকারী, অমায়িক ব্যবহারের জন্যও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। দুইবার তিনি দারপরিগ্রহ করেন, প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা সন্তান হইয়াছিল। প্রথমা পত্নী বিয়োগের অনেক দিন পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর

গর্ভে নয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করে ; তন্মধ্যে সপ্তম গর্ভজাত কালীই উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হন।

মাতা নয়নতারা দেবীর বড়ই সাধ ছিল যে তাঁহার একটী যথার্থ ধার্মিক সাধু সন্তান লাভ হয়। তাই তিনি প্রায়ই কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা এবং পূজাদি করিয়া আসিতেন। আমরা শুনিয়াছি তিনি নাকি মা কালীর নিকট আরও বলিয়াছিলেন যে যদি ঐরূপ একটী সন্তান তাঁহার লাভ হয়, তবে তিনি নিজের হৃদয়ের রক্ত দ্বারা মহামায়ার পূজা করিবেন। এই ভাবে তাঁহার এই পুত্র লাভ হয় বুঝিতে পারিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'কালীপ্রসাদ' ; অথবা মা কালীর কৃপায় বা প্রসাদে পুত্র লাভ হইয়াছে বলিয়া তিনি এই নাম রাখিয়া থাকিবেন।

আমরা পূজনীয় কালী মহারাজের নিকট শুনিয়াছি তাঁহার মাতা অতিশয় ধর্মপ্রাণা ছিলেন এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে রামায়ণ মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। ভজনাদিতেও তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। এই ভাবেই মহারাজ মাতার নিকট হইতে অতি অল্প বয়সেই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে বালক কালীপ্রসাদ কলিকাতা ২১নং নিমু গোস্বামী লেনে স্বীয় বাসভবনে মাতাপিতার যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি লাহাপাড়ায় গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় পড়েন এবং উক্ত পাঠশালা হইতে যদুপণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। তারপর তিনি বঙ্গ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ওরিয়েণ্টেল সেমিনারী নামক স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সকল স্কুলের শিক্ষকগণ কালীপ্রসাদের প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। স্কুলে তিনি অনেক বার পারিতোষিক ও পদক লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যাবধিই কালীপ্রসাদের নূতন নূতন কাজ, নূতন নূতন বিষয় জানিবার একান্ত আগ্রহ দেখা যাইত। এই জন্যই বোধ হয় তিনি বহু বিদ্যায় পরবর্তী জীবনে পারদার্শতা লাভ

করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে এত স্মরণশক্তি এবং চিত্তের একাগ্রতা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন নূতন বিষয় দেখিয়া আসিলে বা শুনিলে তাহার মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য পিতামাতাকে তিনি সর্বদা বিব্রত করিতেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ জবাব মিলিত, ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হইতেন না। এই ছিল তাঁহার জন্মগত স্বভাব। শেষ বয়সেও তিনি সেই ভাব হইতে কখনো বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই।

ছেলেবেলা হইতেই কালীপ্রসাদের হৃদয়ে বড় হইবার আকাঙ্খা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তিনি তৎকালীন বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎসুক থাকিতেন। যেখানেই কোন সভা সমিতি আহুত হইত, সেইখানেই কালীপ্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যাইত। এই ভাবে তিনি ৺সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ৺কেশবচন্দ্র সেন, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বাগ্মীদের বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় বেশ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। স্কুলের পাঠ্যাবস্থাতেই টোলের অনেক পুস্তক পাঠ শেষ করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, কলা, ক্রীড়া প্রভৃতি বহুবিষয়েও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থাতেই ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি পুস্তকাদি পাঠও সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই কালীপ্রসাদের মনে ধর্মের একটা অসীম অনুপ্রেরণা উপস্থিত হয়। এই জন্যই দেখা যাইত, যে কোন ধর্ম পুস্তক পাইলেই তাহা অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন।

অল্প বয়সেই বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কালীপ্রসাদের মনে যোগ-শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ হয়, কিন্তু উপযুক্ত গুরু ব্যতীত যোগ অভ্যাস সম্ভব নহে জানিয়া তিনি প্রকৃত গুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধু, আত্মীয় প্রভৃতি প্রতিবেশীদিগের সহিত তিনি এই বিষয় গোপনে

আলোচনাদি করিতেন; কারণ, পাছে পিতামাতা ঐ কাজ হইতে তাঁহাকে বিরত করেন বা তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেন। এইরূপে কিছুদিন অনুসন্ধানের পর তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমযোগী পরমহংসদেবের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন ও তাঁহার দর্শনের সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। সেইখানে রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পূজারীরূপে ব্রতী ছিলেন। তখনকার দিনে এই পরমহংসকে দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু পণ্ডিত, বিজ্ঞ, মনীষিগণ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। পরমহংসদেব কলিকাতার পশ্চিমে অবস্থিত হুগলী জেলায় কামারপুকুর নামক পল্লীগ্রামে পরম ধার্মিক সত্যনিষ্ঠ খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্ররূপে ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী।

খুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতা নগরীতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদে অধিষ্ঠিত হন। আজিও তাঁহার তপস্যার বেদী দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়।

একদিন কালীপ্রসাদ সেই অপরিচিত যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার-লাভ-মানসে কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি কখনও যান নাই, কাজেই পথ ভুলিয়া তাঁহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা প্রায় এগারটার সময় তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পৌঁছিয়াই জানিতে পারিলেন যে পরমহংসদেব কলিকাতা গিয়াছেন। নৈরাশ্যে তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবশেষে স্থির করিলেন

পরমহংসদেবকে দর্শন না করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিবেন না। শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরাত্রিক হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় নয়টা। একটী ঘোড়ার গাড়ীতে দুই একজন সেবকসহ পরমহংসদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই কালীপ্রসাদ তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে তখনই তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য পরমহংসদেবকে অনুরোধ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে কালীপ্রসাদ পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই দিনই কালীপ্রসাদ পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষা লইয়া সাধনরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি শ্রীশ্রীঠাকুর সেই দিনই তাঁহার জিহ্বায় অঙ্গুলী-দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ধ্যান ধারণার গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

এখন হইতে কালীপ্রসাদ প্রায়ই কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বগৃহ হইতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরু সমীপে উপস্থিত হইতেন এবং গুরুর নির্দেশমত সাধন করিয়া বহু নূতন নূতন আধ্যাত্মিক দর্শন সকল উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়াও তিনি গুরুর সেবাদি করিতেন। এইরূপে ভক্তমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন।

ইংরাজী ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের শেষ দিক হইতে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কালীপ্রসাদ ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার সাক্ষাৎ নির্দেশমত স্বীয় জীবন গঠন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের কিছুদিন পূর্বে কালীপ্রসাদ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ সকলেই ঠাকুরের নিকট গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করেন। এই কালীপ্রসাদই পরবর্তী কালের স্বামী অভেদানন্দ।

ঠাকুরের স্থূল দেহ ত্যাগের পর তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ কেহ কেহ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং কেহ কেহ বরাহনগরে একটী পড়ো

বাড়ীতে একত্রিত হইয়া কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হইলেন। এইখানে কালীপ্রসাদ অধ্যয়ন ও তপস্তায় সর্বদা তন্ময় থাকিতেন বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে "কালীতপস্বী" এই আখ্যা প্রদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ইহাদের কর্ণধারস্বরূপ। এইরূপে কিছুদিন কঠোর তপস্যাদির পর অভেদানন্দ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন এবং বহু তীর্থ ভ্রমণের পর পুনরায় বরাহনগরে গুরুভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণপূর্বক আমেরিকায় চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হন এবং তথায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তখন হইতেই পাশ্চাত্য দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার কার্য আরম্ভ হয় ও বিভিন্ন ভাবে উহা বিস্তার লাভ করে। তথাকার প্রচারাদির জন্য ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক আহূত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় যাত্রা করেন। তথায় প্রায় দশ বৎসর বিভিন্নভাবে মিশনের কার্য পরিচালনার পর ১৯০৬ খৃস্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কলম্বো সহরে পদার্পণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন ও তৎপরে ভারতের নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। পুনরায় স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৭ খৃস্টাব্দে আমেরিকার পথে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। আমেরিকার অনেক স্থানে মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বেদান্ত প্রচারের জন্য স্বামিজী আরও চৌদ্দ পনের বৎসর পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করিয়া ১৯২১ খৃস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। স্বামিজী বেদান্ত প্রচার কার্যে সতের বার আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় যাতায়াত করেন। তিনি সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাদি এবং সারগর্ভ গ্রন্থাদি লিখিয়া আমেরিকাবাসীদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ তিনি এমন সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত এবং হৃদয়ে

তৎক্ষণাৎ ধর্মভাব উদিত হইত। তাঁহার বহু বক্তৃতা পুস্তকাকারে ইংরাজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। এমন নির্ভীক, স্বদেশ-হিতৈষী, দার্শনিক, জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী পৃথিবীতে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকারে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া এই লোকোত্তর মহাপুরুষ ১৩৪৬ সালের ২২শে ভাদ্র শুক্রবার, ইংরাজী ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতে সাত ঘটিকায় কলিকাতা নগরীতে মহাসমাধি লাভ করেন। মহাপুরুষদের স্থূল শরীর চলিয়া যায় বটে কিন্তু বিশ্ববাসী তাঁহাদের ত্যাগ, সাধনা ও কর্মপদ্ধতি কখনো ভুলিতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই সকল মহাপুরুষ জগতে অমর। আসুন, হে ধীর পাঠক, সর্বজীবের কল্যাণকামী এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হই এবং তিনি আমাদের সাধনায় সহায় হউন,—এই প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, হরি ওঁ।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ

প্রথম ভাগ

৩০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪১ সাল, ১৪ই মার্চ ১৯৩৫

সন্ধ্যারতির পর স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। অফিস ঘরে দুই তিনজন লোক অপেক্ষা করিতেছেন; স্বামিজী শয়ন ঘর হইতে এখনও আসেন নাই। জানিলাম চা পান করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি অফিস ঘরে উপস্থিত হইলেন। ভক্তদের কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তে ঠাকুরের কথা তুলিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে স্বামিজী বলিলেন—"তিনি ছিলেন প্রেমস্বরূপ, তাঁর ভালবাসার তুলনা হয় না। আমরা তো ভালবাসার টানেই সব ছেড়ে ছুড়ে তাঁর নিকট গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। নিজের চেষ্টায় কিছুই করিনি। সাধারণ শ্রেষ্ঠ মানুষের যে যে গুণ থাকা দরকার তাতো তাঁর ছিলই। তবে যদি বল কলেজের বিদ্যে তাঁর ছিলনা, তা দেখ, কত বড় বড় পণ্ডিত তো তাঁর কাছে এসে হার মান্‌তো। আবার অবতারের সব লক্ষণই তাঁর ছিল। তোমরা এখন মান আর নাই মান। তখন তো আমরাও মানতুম না।"

১লা চৈত্র শুক্রবার ১৩৪১ সাল, ১৫ই মার্চ ১৯৩৫

ভোরে প্রণাম করিতে গিয়াছি। বেদান্ত সমিতির আরও দুইজন সাধুর সহিত আলাপ হইতেছিল। স্বামিজী দার্জিলিং যাইবেন। যাইবার সব বন্দোবস্ত করিতে বলিতেছেন। শীঘ্রই দার্জিলিং যাওয়া দরকার, অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। ছাদে জল দিয়া তাঁর ঘর ঠাণ্ডা করা হয়।

স্বামিজী বলিতেছেন—"আমি গরম সইতে পারিনে, ঠাণ্ডা দেশে থেকে থেকে এখন গরম দেশে থাকলেই শরীর ঘেমে অস্থির হ'য়ে পড়ে। শীতে বেশ থাকি। আগে শরীর এত মোটা ছিল না, ভুঁড়িও ছিল না। এ হল বাংলাদেশের হাওয়া। দার্জিলিং বেশ। ওখানে গেলে এখনও চড়াই উৎরাই কোরে পায়ের muscle (মাংসপেশী) শক্ত হ'য়ে যায়। এদিকের কাজ শীঘ্র সেরে নাও।" দুই চারি দিনের মধ্যেই যাওয়া স্থির হইল।

২৩শে ভাদ্র সোমবার ১৩৪২ সাল, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

কিছুদিন পূর্বেই স্বামিজী দার্জিলিং হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতেছে। অনেকের নিকট তাহার সম্বন্ধে বলিতেছেন। বাগবাজার হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দার্জিলিংয়ের কথা হইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐকখানি তৈলচিত্র (যাহা সমন্বয়ের ছবি বলা হয়) বড় করিয়া আঁকিবার জন্য বলিলেন। ঐ ছবি ঠাকুর নিজে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন—"বেশ হয়েছে।"

রাত্রির আহাবাদির পর স্বামিজীর নিকট গিয়াছি, সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের জনৈক শিষ্য। স্বামিজী সোনপাপড়ী ভালবাসেন, তাই তিনি এক ঠোঙ্গা সোনপাপড়ী লইয়া আসিয়াছেন। দেখিয়া খুব খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ দোকান হ'তে এনেছ?" কথাবার্তা হইবার পর তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিতে বলিলেন।

২৪শে ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

প্রাতে নীচে আসিয়া বেড়াইয়া গেলেন এবং আমাকে বলিলেন—"তুমি তো কাঠের কাজ শিখেছ; সমিতির জন্য একটা আলমারী করনা।" উপরে গিয়া পুনরায় বলিলেন—"আমি সব কাজ নিজে কোরতে পারি; নিজের জুতো

পর্যন্ত সেলাই কোরে পরেছি। এখনও সেই সব যন্ত্রাদি আছে। কাঠের কাজের যন্ত্রও আছে। বিলেত থেকে আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। ওসব ব্যবহার কোরবে নতুবা সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

২৭শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। কয়েকটী ভক্তের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"তোমরা যাই করনা কেন, ভগবানকে বাদ দিয়ে থাকলে সংসারে দুঃখে পড়তেই হবে, তা বলে কি যারা ভজনাদি করে তারা দুঃখে পড়বে না? তারাও পড়বে—তবে তারা নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না। সব হাসি মুখে সয়ে যেতে পারবে। অশান্তি পাবে না।"

কংগ্রেসের কথা উঠিল। বড় বড় নেতাদের বিষয় বলিলেন—"এরাও কম সাধক নয়। সমস্ত জাতির সুখ সুবিধা দেখছেন। তবে Indian (ভারতীয়) রা বড় হুজুগে; সবাই নেতা হ'তে চায়। কে কার কথা শুনে? এজন্য কংগ্রেসে এত দল। মান যশ খুঁজলে কি দেশের কাজ হয়?"

২৮শে ভাদ্র শনিবার ১৩৪২ সাল, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

আজকাল আরতির পর স্বামিজীর নিকট খুব লোকজন আসিতেছেন, অনেক রাত্রি ব্যতীত তাঁহার সহিত আলাপাদি করিবার সুযোগ হয় না।

একজন স্কুল মাষ্টার বলিতেছেন যে তাঁর ছেলে মারা গিয়াছে। রাত্রিতে ঐ মৃত ছেলে তাঁর স্ত্রীর সহিত কথা বলে কিন্তু তখন তাঁর স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তিনি নিজে সব কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং সে সকলের উত্তরও পান। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কিছুই স্মরণ থাকে না।

স্বামিজী বলিলেন—"তা হ'তে পারে। আত্মাতো মরে না। সে অন্য শরীর আশ্রয় কোরে কথা বলতে পারে। একে বলে 'মিডিয়ম' (Medium)।

ওসব দেশে (আমেরিকায়) এ সবের খুব প্রচলন আছে। আমি এরকম একটা সমিতির সভাপতি ছিলুম, তখন এসব খুব দেখেছি। অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সব সাম্‌নে ঘটেছে। একদিন তো একটা আত্মা এসেছিল। আমি তাকে পরীক্ষা কোরতে গেছি। তা একসঙ্গে অনেকগুলি হাত এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে আর চুমু খেলে। বুঝতে পারলুম শক্তি হরণ কোরে নিলে। মিডিয়মরা অনেক সময় শক্তি হরণ কোরে নেয়। তাই ওসব কোর্‌তে না যাওয়াই ভাল।”

২৯শে ভাদ্র রবিবার ১৩৪২ সাল, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

বিভিন্ন আলোচনার পর মাদ্রাজের কথা আরম্ভ হইল। সেই সব প্রদেশের (দাক্ষিণাত্যের) মন্দির প্রসিদ্ধ। অনেক প্রাচীন কীর্তি ওসব প্রদেশে আছে। পুরীর জগন্নাথমন্দির, কোনারকের সূর্যমন্দির দক্ষিণ ভারতের গৌরবের বস্তু। বেদান্ত সমিতির মন্দির কিরূপ হইবে আলোচনা হইল। বলিলেন—“সমিতির পিছনের জমিতে মন্দিব হ’লে বেশ হয়। কিন্তু সাধারণের দর্শনের অসুবিধাদি হবে। সামনে বিশেষ জমি নেই। তবুও মন্দির ও নাটমন্দির ওখানেই কোরতে হবে। তা ছোট হোক কি করা যাবে।”

৩০শে ভাদ্র সোমবার ১৩৪২ সাল, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি দশটা হইবে। ঘরে কেহ নাই। স্বামিজী খবরের কাগজ পড়িতেছেন। দার্জিলিংএর একজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নানা কথা হইবার পর সমিতিতে ডাক্তারখানা করিবার কথা উঠিল। নিখিল মহারাজের কথা হইল। তিনি ভাল ডাক্তার। মঠে ডাক্তারী করিয়াছেন। বলিলেন—“সাধুদের ডাক্তারী করা ভাল নয়। তাতে শক্তি ক্ষয় হয়। রোগীর অসুখ ভাল হোক এই প্রকার চিন্তার দ্বারা নিজের তপস্যা প্রভাবে সে

রোগমুক্ত হয় বটে কিন্তু নিজের তপস্যা ক্ষয় হয়। তবে কি জানিস—পরার্থে সব করা যায়।"

৪ঠা আশ্বিন শনিবার ১৩৪২ সাল, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

সকালবেলা শোবার ঘরে বসিয়া আছেন। র—মহারাজ ওখানে আছেন। স্বামিজী বলিলেন—"কিরে তোর কি খবর? তুই এবার দুর্গাপূজায় ব্রহ্মচর্য নেনা? পূজায় ব্রহ্মচর্য গ্রহণ কর, গেরুয়া নে, কি বলিস? গেরুয়াতে পবিত্র ভাব জাগিয়ে দেয় আর মনটাও ধরে রাখবার সাহায্য করে। অন্যায় কোরতে গেলেও কেমন বাধ বাধ ঠেকবে। মঠে এখন ব্রহ্মচারীদের পৈতে ও গেরুয়া দেওয়া হয় না। যাদের পৈতা আছে তাদেরই থাকে, কি কোরেই বা দেবে, অনেকে বাড়ী ফিরে যায় কিনা! ওরা এখন ঠেকে ঠেকে শিখেছে। আগে কিন্তু ব্রহ্মচর্য এভাবে গ্রহণ কোরতে হতনা, একেবারে সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য-বেশ নিয়ে থাকতো, তার অনেকপর স্বামিজী (বিবেকানন্দ) এসব করেছেন।"

৫ই আশ্বিন রবিবার ১৩৪২ সাল, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি দশ ঘটিকা। স্বামিজী অফিস ঘরে আসীন। উ—বাবু ও আমি গিয়ে প্রণাম করে বসিতেই বলিলেন—"কিগো খবর কি?"

বিভিন্ন আলোচনাদির পর উপনিষদের কথা আরম্ভ হইল—"আত্মাই সব জীবের প্রকৃত স্বরূপ। অন্নময়—এইজন্য বলা হয় যে অন্নের দ্বারা এই দেহ পরিপুষ্ট হয়। দেহ আছে তাই আত্মা ভিন্নরূপে বর্তমান আছেন। শরীর তো ঘট। এই ঘট ভেঙ্গে দাও কিছুই নেই; তখন বিরাট আত্মা। তারপর প্রাণময় আত্মা; তারপর বিজ্ঞানময়; শেষে আনন্দময়। আত্মদর্শন মানে উপলব্ধি করা। তাঁকে জানা মানে তাই হ'য়ে

যাওয়া।[১] তখন আনন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আত্মার আবরণ ভেদ কোরে যাও তখন কিছুই থাকে না বা কি থাকে তাও বল্‌বার যো নেই। বল্‌বে কে? ঠাকুরের কথা—'নুণের পুতুল সমুদ্দুর মাপতে গেছল আর ফিরে এল না।' খবর কে দেয়? তার পৃথক্‌ অস্তিত্ব কোথায়? তোমরা এখন সাকার নিয়ে চল। ক্রমে ক্রমে এসব বুঝতে পার্‌বে। বেদান্ত টেদান্ত এখন নয়। সাকারভাবে তাঁকে দর্শন কোর্‌তে পারে না—আবার নিরাকার।"

৬ই আশ্বিন সোমবার ১৩৪২ সাল, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি দশটা। স্বামিজী উপবিষ্ট। ঘরে বিশেষ কেহ নাই, কি—বাবু, উ—বাবু বসিয়া আছেন। দুর্গাপূজার কথা হইতেছিল—দেশের অভাব অভিযোগ, আনন্দ নাই—এই সব। তৎপরে ৺সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ৺ঠাকুর কি ভাবে পূজা দর্শন করিয়াছেন তাই বলিতেছেন—"তখন ৺ঠাকুর কাশীপুর বাগান বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি তো আসতে পারবেন না। তা জেনে সুরেশ বাবু খুব দুঃখ কোর্‌ছেন। তাঁর আন্তরিকতা দেখে ঠাকুর সেখানে সমাধিস্থ হন এবং অষ্টমীর দিন সূক্ষ্ম দেহে সুরেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাশীপুর হ'তে ওঁর বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা তৈরী হয়ে গেছল; অনেকে দেখেছেন। সুরেশ বাবু মন্দিরে ৺মায়ের প্রতিমার পার্শ্বে তাঁকে দেখে তবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এ সব সাধারণে কি বুঝবে। ৺ঠাকুর এইভাবে আর একবার হৃদয়ের বাড়ী গেছলেন। ভগবানের এসব করা কিছু শক্ত নয়। তাঁর পক্ষে এগুলি খুব বড় জিনিষ তো নয়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ কোরেছিলেন। তিনি সবই পারেন, তিনি এটা পারেন

১ ইংলণ্ডের দার্শনিক ব্র্যাড্‌লেও বলেন "To know is to be."

আর ওটা পারেন না—তা হ'লে তো তাঁর শক্তির সীমা টেনেই দিলে। ঠাকুর বলতেন—"তাঁর ইতি কোরো না।"

৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ভোরে স্বামিজী নীচে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পায়চারী করিতে করিতে কথা হইতে লাগিল। সঙ্গে তিন চারি জন সাধু ব্রহ্মচারী।—"কিগো? তোমাদের পূজায় কেমন আনন্দ হ'চ্ছে? কাপড় টাপড় কেন! (খুব হাসতে হাসতে) তোমরা তো চ—র কাছ থেকেই কাপড় পাবে। ও হল সমিতির মা; কি বল? (হাস্য) (চ—মহারাজকে দেখাইয়া) ঐ আসছে। তিনি এলে কাপড়াদির কথা তাঁহাকে বলিলেন।" সেবার আমরা অনেকেই কাপড় পাইয়াছিলাম।

১৭ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৫

ভোর বেলা। স্বামিজীর সহিত দেখা হইতেই বলিলেন—"কাল অষ্টমী, ৺মায়ের পূজা করবি; হোম টোম হবে। ছবিতে পূজা করিস। না হয় আমার কাছ থেকে দেখে নিস্। কাল অনেকের দীক্ষাও আছে, সকাল সকাল পূজা সেরে নিবি।" আমি প্রাণায়ামের জন্য বলায় বলিলেন—"বেশ তো কালই হবে।"

১৮ই আশ্বিন শনিবার ১৩৪২ সাল, ৫ই অক্টোবর ১৯৩৫

দ্বিপ্রহরে বিধিমত পূজার পর স্বামিজীকে দীক্ষার জন্য ডাকিতে গেলাম। তিনি নীচে আসিয়া ৺ঠাকুরকে জোড় হাতে প্রণাম করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। মন্দিরে গিয়া আসনে বসিলেন। নিজে মহামায়ার ছবিতে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজান্তে ভক্তদের

ডাকিতে বলিলেন ও তাহাদের হাতে পুষ্পাদি তুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দীক্ষাদি হইয়া গেল। বলিলেন—"আমার হাত ধরে তোল দেখি। এত আর পারি নে। এর পর তোরাই দীক্ষাদি দিস ;—এইতো মন্ত্র।" প্রণাম করিয়া ফুল বিল্বপত্র দিতেই বলিলেন—"চৈতন্য হোক্, চৈতন্য হোক্। তুইতো পূজারী তোর কথা তিনি খুব শুনবেন। তাঁর কাছে সব বলবি। তিনি কল্পতরু। যা চাইবি তাই পাবি।"

১৯শে আশ্বিন রবিবার ১৩৪২ সাল, ৬ই অক্টোবর ১৯৩৫

আজ লোকের খুব ভিড়। স্বামিজীর ঘরে গেলাম। কথা হইতেছিল। স্বামিজী বলিলেন—"শক্তি পূজা না কোরলে কি দেশ জাগে? সব জড় হোয়ে পড়েছে; দেখনা বীরের ভাব একদম নেই। সব কাপুরুষ। জগজ্জননীর কাছে শক্তি চাইতে হয়। কেবল পাঁঠা বলি দিলেই পূজা হয় না।

বেলুড় মঠে (দুর্গা পূজায়) বলি দিতে মায়ের নিষেধ আছে। তাই বলি দেবার যো নেই। তবে দক্ষিণেশ্বর বা কালীঘাট থেকে বলি দিয়ে আনা হয়। (হাস্য) স্বামিজী মঠে পূজা আরম্ভ কোরেছিলেন। শ্রীশ্রীমা দাঁড়িয়ে পূজা নিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাইত পূজার অনুমতি দেন। মঠে বেশ নিষ্ঠার সহিত পূজা হয়। (মঠের দুর্গা পূজা) দেখেছ? একবার যাওনা, প্রতিমাতে পূজা দেখে এসো।"

২০শে আশ্বিন সোমবার ১৩৪২ সাল, ৭ই অক্টোবর ১৯৩৫

আজ বিজয়া দশমী। বহু ভক্ত স্বামিজীকে প্রণাম করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামিজীর সহাস্য মুখ। শান্তি জল দিতে গিয়াছি। বলিলেন—"মন্ত্র জানিস? কি মন্ত্রে শান্তি জল দিতে হয়? আচ্ছা আমি মন্ত্র বলি, তুই জল দে।" স্বামিজী মন্ত্র বলিতেছেন। তৎপরে বলিলেন—"এবার তোমরা

নাও।" নিজেই শান্তি জল লইয়া উপস্থিত সকলকে দিলেন। বিল্বপত্রে ৺দুর্গা নাম লিখিয়া দিলেন।

রাত্রে গিয়াছি, তখন খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল,—"আমি কিছু খেতে পারি নে।" সে দিন রাত্রিতে অ—বাবু সমিতিতে অনেক ফল মিষ্টি পাঠাইয়াছেন। খাইবার সময় স্বামিজী উপস্থিত হইয়া সকলকে দেখিতেছেন আর ওকে দে, তাকে দে, বলিয়া খুব আনন্দ করিলেন। পরে উপরে গেলেন। নীচের অফিস ঘরে সাধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হইল।

২১শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ৮ই অক্টোবর ১৯৩৫

আরতি হইয়া গিযাছে। ঘরে বাগবাজারের দুইজন ধনী ভক্ত। তাঁহাদের সহিত সাধু মহাপুরুষদেব আত্মত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। বুদ্ধের তপস্যা এবং ধর্মের জন্য যীশুখ্রীস্টের শরীর ত্যাগ সম্বন্ধে বলিলেন—"ভগবানের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না এলে কি এসব হয়? যাঁরা ভগবানে একান্তভাবে নির্ভর কোরেছেন, তাঁরা ধর্মের জন্যে, সমাজের হিতের জন্যে নিজের সুখ সুবিধে তো বিসর্জন দিতে পারেনই। নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন। তাঁরা নির্ভীক হ'য়ে যান। তাঁদের ভয় থাক্‌বে কেন? কাকে ভয় কোরবে? শাস্ত্র বোল্‌ছেন,—তখনই সব সংশয় ছিন্ন হ'য়ে যায়। তাঁকে জান, তোমরাও নির্ভীক হ'তে পার্‌বে। আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শন লাভ হ'লে জ্ঞানের বিকাশ হয়। তাঁর দর্শন,—তা আন্তরিকতা থাক্‌লে হয় বৈ কি? গুরুর নির্দেশমত ভজনাদি কোর্‌তে হয়। আমরা ঠাকুরের প্রত্যেকটী কথা মেনেছিলুম। তবে তো হলো?"

২২শে আশ্বিন বুধবার ১৩৪২ সাল, ৯ই অক্টোবর ১৯৩৫

রাত্রি সাড়ে দশটা। স্বামিজী অফিস ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছেন। উ—বাবু ও কি—বাবু সহ গিয়াছি। নানা কথাবার্তার পর "আত্মজ্ঞান"

বইখানির কথা হইতে লাগিল। বলিলেন—"আত্মা সর্বব্যাপক। শরীরের বাহিরেও তিনি, ভিতরেও তিনি। ঠাকুর বোল্‌তেন যে—"কলসী জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে কি হয়? ভেতরেও জল আবার বাহিরেও জল।" তেম্‌নি আত্মা সর্বব্যাপী। উপনিষদে [১] আছে—সূর্য সকল বস্তুতেই পড়ে, শুচি অশুচি কিছুর ভেদ নেই। তাতে সূর্যের কি কিছু দোষ হয়? তেমনি আত্মা পাপপুণ্য সবটার পেছনেই বর্তমান থাকেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি লিপ্ত হন না। তোরা পড়বি না তো কি হবে? একথা আমি বইয়েতে সব লিখেছি। আমার বইটইগুলি পড়ে তবে আসিস্‌। স্বামিজীর (বিবেকানন্দ) বই আর আমার বইয়ে তফাৎ আছে। আমি তো আর তাঁর বই পড়ে আমার বই লিখিনি—অনেকেই তো তাই করে। আমি যা বুঝেছি তাই লিখেছি। মিলিয়ে দেখিস্‌।"

—"আমরা তো অন্যের ধার করা ভাব নিতুম না। জগতকে কিছু দিতেই আমাদের জন্ম। (হাস্য)। ঠাকুর আমাদের কোন অভাব রাখেন নি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই পেয়েছি। তোদের আন্তরিকতা নেই, পাবি কি করে? তোমরা কামিনী-কাঞ্চন পেতে পার, কি বল গো?" (হাস্য)।

২৩শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ১০ই অক্টোবর ১৯৩৫

সকাল নয়টা। সমিতির কয়েকজন সাধু আছেন। র—মহারাজ কি সব কথা স্বামিজীকে কহিতেছেন। স্বামিজী বলিতেছেন—"কেউ কি সাধু হ'তে আসে? সব বেটা শেখাতে আসে। গেরুয়া নিতে পারলেই হ'ল! সন্ন্যাস

---

১ সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
কঠ, উপ, ২।২।১১

নিলে তো কথাই নেই। আমি একজন হ'য়ে গেছি। গুরুর সঙ্গে আর সম্বন্ধ নেই।"

২৪শে আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ১১ই অক্টোবর ১৯৩৫

উপরের দ্বিতল গৃহের পূর্বদিকের বারান্দায় স্বামিজী পায়চারি করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কিরে আজ লক্ষ্মীপূজো কচ্ছিস্ তো? কেন? লক্ষ্মীপূজো কোর্‌লে শ্রী হ'বে, ধন হ'বে। ধন সাধুদের কি প্রয়োজন? ধন দ্বারা এ সমিতির কাজ হ'বে? টাকা না হ'লে কি কোরে কাজ হ'বে? তোরা দেখছি সব জঙ্গলে থাক্‌বার সন্ন্যাসী। সাধে কি আর বলি তোদের দ্বারা সমিতি চলা কঠিন। ঠাকুরের মন্দির হোচ্ছে না। টাকা হ'লে কি এতদিন মন্দির না কোরে রাখতুম্? যা লক্ষ্মীপূজো কর। আমি কাপড়-চাদর দিচ্ছি। ঘটেই পূজো হ'বে। আর না হয় ঠাকুরের মূর্তিতেই লক্ষ্মীর মন্ত্রে পূজো কোরবি। ঠাকুরই সব, বুঝলি? 'পুরোহিত দর্পণ' বের কর; আমি দেখিয়ে দি।" পূজো অন্তে স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে যাইতেই বলিলেন—"কেমন পূজো ঠিক করেছিস্ তো? যা যা দেখিয়েছিলুম সব কোরেছিস? ঘণ্টা বাজাসনি তো? দেখ্ তুই পূজো কচ্ছিস, আর মন্দিরের জন্যে ১৫০ টাকা পেলুম্। এখনই একজন দিয়ে গেল। ৺লক্ষ্মীপূজো কোরেছিস ব'লে টাকা এলো, (হাস্য) ঘটটা ঠিক কোরে রেখে দিস। আস্‌ছে বৎসর এই ঘটে পূজো হ'বে।

২৮শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৫

রাত্রে বলিতেছেন—"দেখ্, কে কি ভাব নিয়ে আসে তা আমার কাছে এলেই বুঝতে পারি। তাই অনেককে বলি যাও আরতি দেখগে। আমি এখন বিশ্রাম কোরব। পাপ কাজ কোরছে আর এখানে ছুটে আসছে। এদের ছুঁতে ভয় হয়।"

২৯শে আশ্বিন বুধবার ১৩৪২ সাল, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩৫

বৈকাল বেলা স্বামিজী নীচে মন্দির দেখিতেছেন এবং কোথায় কোথায় কাজ হইবে দেখাইতেছেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন—"নাটমন্দির আলাদা ভাবে হওয়াই উচিত। আগে কিন্তু এসব দেশে মন্দিব ও নাটমন্দির এক সঙ্গেই করতো। অনেক প্রাচীন মন্দিরে এইরূপ দেখা যায়। বড় বড় পুরানো মন্দিরে কিন্তু জানালা দরজা তেমন নেই।—তুমি একটা নক্‌সা আঁকো, ওটা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

৩রা কার্তিক রবিবার ১৩৪২ সাল, ২০শে অক্টোবর ১৯৩৫

সন্ধ্যাবতির পরে মঠের কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে স্বামিজীর ঘরে গিয়াছি। ভক্তরা আমেরিকার সভা সমিতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বামিজী বলিলেন—"ওসব দেশে মেয়েদের বেশ ধর্মভাব আছে। তবে আমাদের দেশে কি নেই? আছে; তবে আমাদের দেশের মেয়েদের চাইতে ওরা বেশী সুবিধে পায়। এদেশে কেউ যদি কিছু প্রকাশ্য ভাবে কোরতে যায় তো তার সতীত্ব গেল আর কি! পুরুষরা এদের কিছু কোরতে দেয় না। অথচ গার্গী, মৈত্রেয়ী এদেশেরই মেয়ে। মৈত্রেয়ী কত বড় জ্ঞানী। ওসব দেশের মেয়েরা সভা-সমিতিতে বেশ যোগ দেয়। দেখনা নিবেদিতা ভারতের জন্যে কিরূপ ত্যাগস্বীকার কোরেছে। দার্জিলিং মঠে তাঁর নামে একটী বাড়ী করা হোয়েছে। তাঁর শরীর ওখানেই গেছে। এ রকম মেয়ে কি এদেশে নেই? খুব আছে, তারা সুযোগ সুবিধে পায় না।"

৪ঠা কার্তিক সোমবার ১৩৪২ সাল, ২১শে অক্টোবর ১৯৩৫

সমিতিতে শ্রীশ্রীকালী পূজা হইবে। তাই স্বামিজী বলিতেছেন—"প্রতিমার জন্যে আহিরীটোলা গিয়ে বলে এসো, যেন সুদর্শন হয়। প্রতিমার

মেঘের বরণ, হ'বে। প্রতিমা সুন্দর না হ'লে ভাব জমে না। স—মহারাজ পূজো কোরবেন। তিনি মঠের সাধু। শরৎ মহারাজ তাঁকে পূর্ণাভিষেক দিয়েছেন।" তাঁকে খবর দিতে বলিলেন।

ঘরে কয়েকজন লোক আসিলে অন্য বিষয়কথা আরম্ভ হইল। তাঁহারা চাকুরীর জন্য স্বামিজীর নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

৯ই কার্তিক শনিবার ১৩৪২ সাল, ২৬শে অক্টোবর ১৯৩৫

অদ্য সমিতিতে শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা। সমিতিতে প্রতিমায় পূজা হইবে। স্বামিজী রাত্রিতে পূজার ঘরে গেলেন। কয়েক জন সন্ন্যাসীকে ও গৃহস্থ ভক্তকে পূর্ণাভিষেক দিলেন। এই জন্য তিনি সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত ঠাকুরঘরে ছিলেন। অন্য কাহাকেও ঐ পূজা দর্শন করিতে দেওয়া হয় নাই।

প্রতিমায় পূজা সমিতিতে এই প্রথম। সন্ধ্যায় পূজারম্ভে স্বামিজী আমায় বলিলেন—"এখানে বোস্, পূজো শিখেনে।" রাত্রি প্রায় তিনটায় স্বামিজী পুনরায় পূজার ঘরে গেলেন। তখন পূজা সমাপ্তপ্রায়। আমাদের কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও গৃহীভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা বোস, তোমাদের অভিষেক দেব।" অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়িয়া স্বামিজী শান্তিজল দিলেন। এসব ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর বলিলেন—"তোমাদের অভিষেক দিয়ে দিলুম।"

১০ই কার্তিক রবিবার ১৩৪২ সাল, ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৫

সকালে প্রণাম করিতে যাইতেই বলিলেন—"কিগো? গতরাত্রে কেমন হ'ল? এমন আর হয় নি। বেলুড় মঠে শরৎ মহারাজ একবার অভিষেক

দিয়েছিলেন, আর বড় মহারাজ একবার। আর কেহ কোন দিন দেননি। তোদের ব্রহ্মচর্যের চে'য়ে এ বড় জিনিষ। সব দেবকার্যে তোমাদের অধিকার দিলুম। এখন হ'তে সব দেবতার কাজে তোদের অধিকার হ'ল।"

রাত্রি নয়টা দশটা। ঘরে তখনো অনেকে আছেন। তন্ত্রের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—"শিবতো পৃথিবী; শক্তি—চৈতন্য শক্তি। আর এক দিক দেখ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতির মূল কারণ। শিব-শক্তির মিলন। লিঙ্গপূজো মানে যোনিপূজো; যাতে যোনি দিয়ে আর না আস্‌তে হয়। ওহ'ল সৃষ্টির প্রতীক, মুণ্ডমালা সৃষ্টির বীজ, জিহ্বা—রসনাকে সংযত করা; এরকম সব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।"

১১ই কার্তিক সোমবার ১৩৪২ সাল, ২৮শে অক্টোবর ১৯৩৫

রাত্রি আটটা হইবে। য—বাবু সহ স্বামিজীর নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়াই স্বামিজী বলিলেন—"কি-গো? তুমি কখন এলে? তোমার পরীক্ষার ফল কি হল? পাশ কোর্‌বে তো?" য—বাবু—"আজ্ঞে, হাঁ। জীবনে যতগুলি পরীক্ষা দিয়েছি একটাতেও তো ফেল করিনি।" স্বামিজী—"বল কি? গীতা, ভাগবত, রামায়ণ এসব পড়েছ?" য—বাবু—"আজ্ঞে না" স্বামিজী—"তবে তোমার সব পড়া ব্যর্থ হ'য়েছে। আচ্ছা তুমি তো Mathematics এ (অঙ্কে) first class first হ'য়েছ? আমি একটা অঙ্ক দিচ্ছি, কর দিকিনি।" স্বামিজী তাঁহাকে একটা অঙ্ক দিলেন। কিন্তু তিনি পারিলেন না। স্বামিজী—"তবে তো ফেল কোরলে? তোমার মত বিদ্যা থাকলে আমি অনেক কিছু কোরতে পারতুম (হাস্য)। এই জন্যেই তো আমি বলি তোমরা পাশকরা মূর্খ।" তৎপর বলিলেন—"সাধন-ভজন না কোরলে ঠিক ঠিক জ্ঞানের বিকাশ হয় না।"

১৬ই কার্তিক শনিবার ১৩৪২ সাল, ২রা নভেম্বর ১৯৩৫

সন্ধ্যার পর। স্বামিজী বলিতেছেন—"তোরা কি ধ্যান-জপ করিস বুঝতে পারি নে। আমি এলাহাবাদে ঝুসি ব'লে যে জায়গা আছে, সেখানে কিছুদিন ছিলুম। ওখানে এক এক বার ধ্যান কোরতে ব'সে দশ এগার ঘণ্টা চলে যাবার পর মনে হ'ত যেন পাঁচ মিনিট মাত্র হ'ল; মন এত উঁচুতে উঠতো। সময় কোথা দিয়ে চলে যেত বুঝতে পারতুম না।"

—"আর একদিন লণ্ডনের এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছি। বক্তৃতার বিষয়ে এত তন্ময় হ'য়ে গেছি যে সেখান দিয়ে একদল সৈন্য ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে চলে গেল, আমি কিছু জানতেই পারিনি। সভা ভেঙ্গে যাবার পর কয়েক জন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা কোরলেন—"আপনার কোন অসুবিধা হয়নি তো?" আমি শুনে তো অবাক্। বল্লুম আমি তো কিছুই জানিনে। একেই বলে তন্ময়তা। আমার জীবনে এমন অনেক বার হ'য়েছে। তোরা একটু ধ্যান কোরতে গেলে—কিছুতেই মন স্থির কোরতে পারিস নে; আর আমাদের ওর জন্যে ভাবতেই হ'ত না। যেন আপনা হ'তেই ওসব হ'য়ে যেত। তোরা চেষ্টা কর তোদেরও হ'বে। তবে কি জানিস, সৎসংস্কার আর ঠিক ঠিক গুরু কৃপা হওয়া চাই। তোদের হ'বে বৈ কি। যারা ঠাকুরকে ধরে আছে তাদের ব্যবস্থা তিনিই কোরবেন।"

১৭ই কার্তিক রবিবার ১৩৪২ সাল, ৩রা নভেম্বর ১৯৩৫

আজকাল বহু লোক দীক্ষা লইতে আসিতেছেন। কেহই ফিরিয়া যাইতেছে না। হ—নামে একটী ছোট ছেলে আমাকে সঙ্গে লইয়া দীক্ষার জন্য স্বামিজীর নিকট গিয়াছে। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিগো? খবর কি?" আমি—"এই ছেলেটী দীক্ষা লইবে।" স্বামিজী—"এত ছোট ছেলে, দীক্ষা নিয়ে কি হ'বে?" ছেলেটী বলিল—"কেন, ঠাকুর তো আমার বয়সেই

মন্ত্র নিয়েছিলেন। আমিও নেব।” শেষে ছেলেটী রোক করিয়া ধরিল। তখন স্বামিজী বলিলেন—“নেবে তো এস; এখনই দিচ্ছি।” বলিয়া অফিস্ ঘরেই তাহাকে দীক্ষা দিলেন। কোন প্রকার উপকরণ দরকার হয় নাই। তাহাকে ভজনাদির বিধি দেখাইয়া দিলেন, আর ঠাকুরঘরে গিয়া জপ করিতে বলিলেন।

১৮ই কার্তিক সোমবার ১৩৪২ সাল, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—“দেখ, কত লোক রোগ শোক নিয়ে আসে তার ইয়ত্তা নেই। একবার একটী যক্ষ্মারোগী এসে খুব বিরক্ত করে, তাকে আশীর্বাদ কোরবার জন্যে। কি আর করি? শেষে মাথায় হাত দিয়ে বোলতে তবে ছাড়লে। তার ফলে হ'ল, কয়েকদিনের মধ্যেই তার অসুখ ভাল হ'য়ে গেল, কিন্তু আমার কফের সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগ্‌ল। মাস কয়েক এভাবে রক্ত উঠে তবে যায়! তার ভোগ আমার শরীর দিয়ে হ'য়ে গেল। ঠাকুরের এমন কত বার হয়েছে। এইজন্যে যা-তা রোগী আমার কাছে এলে ভয় হয়। শেষে কি পাগল টাগল হ'ব নাকি?”

—“এখানে সকলকে আসতে দিতে নেই। ঠাকুরের অসুখের সময় আমরা সকলকে দেখা কোরতে দিতুম না। তিনি বলেছিলেন এতে তাঁর শরীর তাড়াতাড়ি চলে যাবে। আমরা শুনে দরজায় ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বসিয়ে দিয়েছিলুম। শেষে ঠাকুর শুনে আমাদের বারণ করেছিলেন; তবে গৃহস্থ ভক্ত আস্‌তে আরম্ভ করে।”

১৯শে কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ৫ই নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী বলিতেছেন—“যখন ধর্মের পতনের সময় হয়, তখনই তাতে বিভিন্ন কুসংস্কার ঢোকে। বুদ্ধের পরে তাঁর ধর্মে কাপালিকতা ঢুকেছিল। এ পর্যন্ত যত ধর্ম আছে তার মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম বেশী প্রচার হ'য়েছিল। পতনও তেমনি।

বৌদ্ধ এদেশে নেই বল্লেই হয়। তন্ত্রে এসকল (কুসংস্কার) এল বুদ্ধের পরবর্তী যুগে। হ্যাড়ানেড়ী সব ঢুকে অহিংস ভাবকে হিংস কোরে তুল্‌লে। বুদ্ধের কি হৃদয় বল দেখি? এখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর তাঁর সে মহান্ আদর্শ কোথায়?"

সারনাথ বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের সম্বন্ধে বলিলেন—"ওখানে আগে বৌদ্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতি কিছু ছিল। বুদ্ধগয়া ওদের খুব বড় তীর্থ। ওখানে এখনো বোধিসত্ব ব'লে বেদীপীঠটী আছে। কে বল্লে বুদ্ধ নাস্তিক? আমরা বলি নির্বিকল্প আর ওরা বলে নির্বাণ। শূন্যবাদ মানে নির্বাণে জগৎপ্রপঞ্চ থাকে না। আমরা বলি,—সমাধিতে কি আছে বলা যায় না। তার মানে কিছু আছে এইতো? ঠাকুর বোল্‌তেন—তাঁর ইতি কোর্‌তে নেই। ভগবানকে বুঝা বা তাঁকে জেনে ফেলা, তা কি সম্ভব হয়? তিনি কি তা কেউ মুখে বোলতে পারে না। কিছু কিছু উপলব্ধি করা যায়, তা'বলে কি তাঁকে বুঝে ফেলেছি বলা চলে? তিনি যে সীমাহীন; অসীম; আদিও নেই অন্তও নেই। বুঝবে কি? তাঁর অনন্ত ভাব, অবতাররাই তাঁর সীমা পায় না, তা ক্ষুদ্র মানুষের আর কি কথা?"

২০শে কার্তিক বুধবার ১৩৪২ সাল, ৬ই নভেম্বর ১৯৩৫

অদ্য জগজ্জননীর পূজা। দিনে শ্রীশ্রীমায়ের পূজাদি হইয়া গেল। রাত্রিতে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা, স্বামিজী মন্দিরে আসিয়া বসিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পূজার মন্দিরে থাকিয়া নিজের ঘরে গেলেন। পুনরায় আসিয়া আড়াই ঘটিকা পর্যন্ত রহিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল। মন্দির হইতে বাহির হইতেছেন চোখ-মুখ লাল। এতক্ষণ মন্দিরে বসিয়া ধ্যান-ধারণা করিতেছিলেন। শরীর কাঁপিতেছে। বাহিরের কাহাকেও পূজামন্দিরে যাইতে দিলেন না। আমি নিকটে গেলেই বলিলেন—"দেখ্‌ আমায় ধর, কাছে আয়, তোকে ভর

দিয়ে চলি।" বাহিরে আসিতেই অনেকে প্রণামাদি করিল। দ্বিতলে উঠিতে খুব কষ্ট হইতেছিল। অতি কষ্টে আর একজন সাধুসহ তাঁহাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। উঠিবার সময় মাঝে মাঝে 'জয় মা', 'জয় মা' বলিতেছেন। শয়নঘরে আনিয়া তাঁহাকে ইজি চেয়ারে বসান হইল। হাত দিয়া ইঙ্গিত করিলেন—"তোমরা যাও। দরজা ভেজিয়ে দাও।"

২১শে কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ৭ই নভেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি প্রায় দশটা। স্বামিজী বলিতেছেন—"দেখ্, তোরা সব কর্মফলে ভুগে মরছিস্। সংসারীদের অবস্থা দেখ্, কেবল ছেলেপিলে হ'চ্ছে আর তাদের নিয়ে কর্মফল ভুগছে। উভয়েরই ভোগ। সব চাইতে ভাল, ছেলে-পিলে যাতে কম হয়, তার জন্যে সংযম পালন করা। নিজেরা সংযমের বাঁধ রাখ্তে পারে না। এর একটী মেয়ে জন্মাবধি বিকলাঙ্গ, তাকে নিয়ে ওরা ভুগছে, মেয়েটীও ভুগছে, উভয়েরই ভোগ। যাতে ভোগ কেটে যায় তার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কোরতে হয়।"

কয়েকজন সেবক আসিয়া বসিলেন। অন্য প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিলেন—"মানব জন্ম এত জন্মের পর পেয়েছ, তা একটু সার্থক কর। কত পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হ'য়ে তবে মানুষ হ'য়েছ। একটু তপস্যা কর [১]।"

—"তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কোরতে চাও? সংযম অভ্যাস কর। ব্রহ্মচর্য পালন কর। তা না ক'রে শক্তি ক্ষয় কোরলে কি ক'রে দীর্ঘজীবন পাবে? এখনো মানুষ চেষ্টা কোরলে একশো দেড়শো বৎসর বাঁচতে পারে। আর বেশীদিন বেঁচেই বা লাভ কি? সাধন ভজন কোরে ভগবান লাভ হ'লেই হ'ল। তাহ'লে আর বাঁচবার সাধ থাকে না। মানুষের

১ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজন্ম লাভ হয়।

মধ্যেও পশু থাকে। দেখনা এক এক জনের ভেতর কেমন পশু ভাব। সব মানুষ কি মানুষ? অনেকেই মানব দেহধারী পশুমাত্র। পূর্বজন্মে পশু ছিল, সেই সংস্কার র'য়ে গেছে। অনেকে ভগবান মানেই না। সকলে কি ভগবানের চিন্তা করে? দেখনা এইত বায়োস্কোপ ভর্তি হ'য়ে গেছে। আমার এখানে কয়জন আসে? তারা চায় ক্ষণিক আনন্দ। স্থায়ী আনন্দ তো তারা চায় না। আমি একদিন ঠাকুরকে বলেছিলুম—আমি কিছু মানিনে। তাতে ঠাকুর বলেছিলেন—তুই কি মানিস্? আমি বল্লুম—কিছুই মানিনে। তিনি বল্লেন—"বেদ, বাইবেল, কোরাণ, লোকাচার কোনটাই মানিস্‌নে?"

আমি—"না।"

তিনি—"ভগবান মানিস?" আমি বল্লুম—"না"।

তাতে তিনি বলেছিলেন—"তুই আমার কাছে বলেছিস তাই, অন্য লোক হ'লে গালে চড় মেরে দিত। নরেন এসব মানতো না, এখন সব মানে। তুইও পরে সব মান্‌বি।" বাস্তবিক আমি এখন সব মানি। তাঁর বাণী ঠিক ঠিক ফলে গেছে।"

২২শে কার্তিক শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ৮ই নভেম্বর ১৯৩৫

রাত্রিতে বিবিধ আলোচনার পর বলিতেছেন—"অনেকে বলে আমার বাক্‌সিদ্ধি হ'য়েছে। আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারি নে। তবে দেখছি যাকে যা বলি তা ফলে যায়। কাশীপুর থাকার সময় আমরা সব গুরুভাই একত্র ছিলুম। একটা পড়ো বাড়ীতে আছি। তার পাশে একটা পুকুর ছিল। তাতে পাশের এক বাড়ীর মেয়েছেলেরা আস্‌তো, একমাত্র ঘাট। ঘাট একটু নোংরা হ'য়েছে দেখে ঐ বাড়ীর একটা বুড়ো মেয়ে আমাদের সকলকে বিশেষ কোরে শশীমহারাজকে লক্ষ্য কোরে যা-তা গালাগাল দিচ্ছিল।

আমি তখন ওখানে দাঁড়িয়েছিলুম। সে বল্‌ছিল—"আমার স্বামী বাড়ী এলে তোদের সব বেটাদের ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দেবে।" শুনে খুব বিরক্ত হ'লুম। আমি অমনি বলে ফেল্লুম, যে দেখ্, অমন কোরে সাধুদের বকুনি দিস্‌নে; সাবধান হ'য়ে কথা বল্‌বি। তাতে আরও বেশীকোরে বকুনি দিতে লাগলো। আমি বল্লুম, তোর স্বামী যদি সাধুদের ঝেঁটাতে আসে তো সঙ্গে সঙ্গে তার মরতেও হবে জানবি। তারপর আমাদের ঝগড়া সে শুন্‌লে কিনা জানিনে, তার কিন্তু মুখে রক্ত উঠে মৃত্যু হ'ল। আমি তো শুনে অবাক। আর একবার শশীমহারাজ আমায় বোলছিলেন মাদ্রাজে, প্রকাশ্য এক সভায় বক্তৃতার সময় একবেটাতো আমাদের গালাগাল দিচ্ছিল। আমি প্রতিবাদ করলুম। আরও কিছু বোলতে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে সঙ্গে শশীমহারাজ রুমাল দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন; বল্লেন—"কালী, কোচ্ছ কি? তুমি যে বাক্‌সিদ্ধ, যা বোলবে, তাই ফলে যাবে। ওরা বুঝতে পারে না, তাই অমন কোরে মিথ্যা প্রতিবাদ করে। তোমার কাশীপুরের ঘটনা মনে নেই?" এমন অনেক ঘটনা আছে যাকে যা বলি তা সত্যিই ফলে যায়; যাবেও। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হ'লে তোদেরও হ'তে পারে, এ বিচিত্র কিছু নয়।"

২৩শে কার্তিক শনিবার ১৩৪২ সাল, ৯ই নভেম্বর ১৯৩৫

বিকাল বেলা। একটী ভক্ত আছেন। তাঁহার বাড়ীতে একজনের অসুখ, সেই সব কথা বলিতেছেন। স্বামিজী বলিলেন—"শরীর ধারণ কোরলে রোগ-শোক থাক্‌বেই, তার আর বিচিত্র কি? দেখ না আমরাই কত ভুগছি।"

ভক্ত—"আপনারা তো অন্যের পাপ নিয়ে ভূগছেন।"

স্বামিজী—"তা বৈ কি। তাই তো ভূগতে হয়। দেখনা যত শিষ্য বেশী কোর্‌বে তত বেশী ভোগ। মহাপুরুষ মহারাজ কত শিষ্য কোরেছিলেন,

সেই জন্যে কম ভুগেছিলেন কি ? আমাকেও তো শিষ্যদের পাপ-তাপ নিয়ে ভুগ্‌তে হচ্ছে ? এই দেখনা কত পত্র এসেছে। এ সকল পত্রে আছে কেবল, ওর রোগ ভাল হোক্, ওর শরীর ভাল হোক্, আশীর্ব্বাদ করুন, এর বে হোক্, তার ছেলে হোক্ ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমরা সাধন-ভজন কোরবে না, কেবল আশীর্বাদ চাও। ঠাকুর কখনো কাউকে আশীর্বাদ কোরতে চাইতেন না। বোলতেন—"মায়ের যা ইচ্ছে তাই হ'বে। আমার ইচ্ছায় কিছু হয় না।" ভগবানের নামে এসেছি; তা তোরা একটু ভগবানের নামে এখানে আয়; তা নয়, সন্ন্যাসীর কাছে কেবল স্বার্থ নিয়ে আসবি। ওর রোগ মুক্ত হোক্, ওর বে হোক্! সংসারের জ্বালা এড়াতেই তো এই বেশ; দেখছিস না ? আবার তোদের সকলের পাপ নিয়ে জ্বালা ভুগ্‌তে হচ্ছে। সেদিন একটী ছেলের গাল ফুলে গেছ্‌ল, তার পিতামাতা এসে এমন ধর্‌লে যে আশীর্বাদ না কোরে পারলুম না। তার পর দিন আমার গাল ফুলে গেল; দেখ্, কি ব্যাপার, এর ভেতর দিয়ে ভোগ হ'য়ে গেল।"

রাত্রি দশটায় স্বামিজীর কাছে গিয়াছি। নানা আলোচনা হইতেছে। আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামিজী বলিলেন—"সেখানে একবার আমার পা ভেঙ্গে গেছ্‌ল। ডাক্তার বল্লেন—"bone-fracture" হ'য়ে গেছে। আমি তখনও কিন্তু বক্তৃতা দিচ্ছি। ডাক্তার ছেড়ে দিলুম। অমনিই শেষে ভাল হ'য়ে গেল। will-force (ইচ্ছাশক্তি) থাকলে যে কোন রোগ বিনা চিকিৎসাতেই ভাল হ'তে পারে। ডাক্তার কিন্তু বোলেছিল আমি চিরদিন খোঁড়া হ'য়ে থাক্‌ব। পরে সেই ডাক্তাররাই আমার পা দেখে অবাক হ'য়েছিল। আমার শরীর অসুস্থ হ'লে কি করি জানিস ? একবার মাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা ভাবি, কোথায় অসুখ, আমি অসুস্থ নই, আমি রোগমুক্ত। তখন সব অসুখ পালিয়ে যায়। এসব মনস্থির না হোলে হওয়া কঠিন।"

২৪শে কার্তিক রবিবার ১৩৪২ সাল, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজীর সহিত আলোচনা হইতেছে। কয়েক জন ভক্ত আসিয়া বসিলেন।

প্রশ্ন—"আমরা তো পাপীতাপী তাই আপনার আশ্রয় নিয়েছি। আপনি দয়া কোরে আমাদের চৈতন্য কোরে দিন।"

স্বামিজী—"মাকে ডাক, সব হ'য়ে যাবে। তাঁর নিকট কাঁদ, ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ। বিশ্বাস-ভক্তির প্রয়োজন। ওসব কাঁদতে কাঁদতে হ'য়ে যায়। তখন তিনি এসে দেখা দেবেন। তোরা চাস ফাঁকি দিয়ে শান্তি পেতে। তাকি হয়? ঠাকুর কেমন কেঁদেছিলেন, তাই তাঁকে পাষাণ ভেঙ্গে মা দেখা দিয়েছিলেন। অমন ভাবে না ডাকলে কি শান্তি পাওয়া যায়? আমার ঐ ফটোখানা দেখ। আগে, ঠাকুরের দেহ যাবার পর কেমন ধ্যান ধারণায় শরীর কৃশ হ'য়ে গেছল। ঐরকমে কত কঠোর সাধনা করেছি। তোমরা ভাবতেই পারনা। তখন আমিও মা, মা, ব'লে কত কেঁদেছি। এখন সিদ্ধ হ'য়েছি।"

প্রশ্ন—আপনার উত্তম বৈদ্য, সব কোরতে পারেন।

স্বামিজী—"আমায় কি বুকে হাঁটুদিয়ে চৈতন্য কোরে দিতে বলিস? তোরা উপযুক্ত হোসনি। জানিস না? গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক। (সকলের হাস্য) আমি পৃথিবীটা ঘুরে এসিছি, এক মায়ের নামে; আমার ধারণা ছিল যিনি জন্মাবার আগে আহার দিয়েছেন, তিনিই আমার খাবার শোবার বন্দোবস্তও কোরে রেখেছেন। এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে সব জায়গা ঘুরে এসেছি। কোথাও এক পয়সা স্পর্শ কোরব না—এই প্রতিজ্ঞা ছিল। আর নিজের জন্যে কোথায়ও কখনো রান্না কোরব না এবং নিজের জন্যে কিছু চেয়ে খাব না—এই প্রতিজ্ঞা আমি সারা জীবন পালন করেছি। ঠাকুরের উপর নির্ভর কোরে থাক্‌লে সব জুটে যায়; কোন ভাব্‌তে হয় না। তবে, ঠিক ঠিক নির্ভরশীল হ'তে হ'বে, নতুবা হ'বে না।"

২৫শে কার্তিক সোমবার ১৩৪২ সাল, ১১ই নভেম্বর ১৯৩৫

সন্ধ্যায় মঠের একজন সাধু আসিয়াছেন। স্বামিজী তাঁহাকে বলিতেছেন—"তোমাদের ওখানে আজকাল কেমন সাধু ব্রহ্মচারী হোচ্ছে? এখনতো বি, এ পাশ না কোরলে সাধু হ'তে দেওয়া হয় না। আমার এখানে কিন্তু তা নয়, কেহ এলেই দেখি তার ভিতরটা পাশ কিনা, তার সাধন-ভজন আছে কিনা। ওই হ'ল সাধুর প্রাণের জিনিষ। কত বি, এ পাশ করা সাধু ভণ্ডামি কোরে বেড়াচ্ছে। তার চাইতে সাধুভাব থাকে এমন মূর্খও ভাল।"

—"আত্মজ্ঞান লাভ—কোরবার জন্যে যাঁরা সাধু হ'তে চায় তাদের পাশ করা বিদ্যের কি দরকার? ওতে কি জ্ঞানের বিকাশ হয়? জ্ঞানের বিকাশ হয়, এমন বিদ্যেই হ'ল বিদ্যে। ঠাকুর বোলতেন—"ব্রহ্মবিদ্যেই হ'ল বিদ্যে [1] আর সব অবিদ্যে।" আমি এমন অনেক দেখেছি কয়েকটা পাশ কোরেছে—অথচ শাস্ত্রের জ্ঞান মোটেই নেই। মেরুদণ্ড না হ'লে কি মানুষ দাঁড়াতে পারে? ধর্ম হ'ল মানুষের ও জাতির মেরুদণ্ড।"

২৬শে কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ১২ই নবেম্বর ১৯৩৫

সন্ধ্যারতির পর স্বামিজী বলিতেছেন—"তাঁর (ঠাকুরের) কি ভালবাসা! এমন ভালবাসা কখনো কোন যুগে হ'য়েছিল কিনা জানিনে। সেই ভালবাসায় আমরা বাড়ী ঘর সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয়ে গিয়েছিলুম। তখন আমাদের বয়স অল্প, আমরা ছেলেমানুষ। সেই বয়সেই পিতামাতা ছেড়ে তাঁকে সর্বস্ব কোরে নিয়েছিলুম; শুধু তাঁর ভালবাসায়। তিনি যেন ছিলেন মা কালীর মুখশ্রী। সবসময় যেন মা-ই হ'য়ে আছেন। কোন যুগে এমন

---

১ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য·········পরা চৈবাপরা চ।
·········পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। মুণ্ডক-উপ ১।১।৪—৫

মুহুর্মুহুঃ সমাধি শুনেছ কি ? Universityর Machineএ (বিশ্ববিদ্যালয়ের কলে) তিনি তৈরী হননি। Practical man ছিলেন তিনি। দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁর কথা জগৎময় হ'য়ে গেল। দেহ যেতে না যেতেই যেন প্রচার হ'য়ে পড়লেন। আমি তাঁর অসুখের আরম্ভ হ'তে শেষ পর্যন্ত সেবা কোরেছিলুম। মথুর বাবু, রাণী রাসমণি এঁরাও ধন্য; তাঁরাও ঠাকুরের সেবা কোরবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেক তপস্যা না থাক্‌লে কি স্বয়ং ভগবানের সেবা কোরবার সুযোগ কেউ পায় ? সাধু ভাব বা সাধু হওয়া, পূর্ব জন্মের সুকৃতি না থাক্‌লে হয় না। সকলের ভেতর সৎভাব থাকে না। অনেকে কাছে থেকেও বুঝতে পারে না। ঠাকুর কঠিন সাধনতত্ত্ব অতি সহজ কোরে দেখিয়েছেন। তাঁর দরিদ্রনারায়ণ সেবা হ'লো আদর্শ। কাশীর পথে, বৃন্দাবনের পথে পাল্কীতে যেতে যেতে আরও কত স্থানে মথুর বাবুকে দিয়ে তিনি দরিদ্রনারায়ণ সেবা করিয়েছেন। অন্যের দুঃখে তাঁর কত ব্যথা ছিল ; ভাব দেখি ?"

২৭শে কার্তিক বুধবার ১৩৪২ সাল, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৫

সকাল প্রায় নয়টা হইবে। শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায়, স্বামিজী বলিলেন—"শরীর ? তা বেশ আছে।" শরীর-তত্ত্ব আলোচনা হইতে লাগিল। পরে বলিতেছেন—"শরীর তো প্রত্যহই পরিবর্তন হ'চ্ছে। শরীর তো মিথ্যে জিনিষ ? তা নিয়ে এত বিচার কেন ? তাঁর ভেতর যিনি আছেন তাঁকে জানলেই হ'ল। হারমোনিয়াম যেমন নিজে বাজতে পারে না একজন বাদক চাই, শরীরও তেমনি নিজে চল্‌তে পারে না, তার ভেতর একজন কর্তা আছেন। ইনিই হ'লেন আত্মা। আত্মাকে জানাই হ'ল না, শরীরতত্ত্ব নিয়ে কি হবে ? তাঁকে [1] জান তাঁকে জান্‌লে সুখ-দুঃখের

[1] আত্মানম্ বিদ্ধি—উপনিষদ

পারে যাওয়া যায়, এইরূপ বিচার কর। সময়ে সবই হ'বে। এক জন্মে কি হয়? বহু জন্ম পর তবে সিদ্ধি।" [১]

বিবিধ আলোচনার পরে সমিতির প্রতীকের কথা উঠিল। স্বামিজী ইহার অর্থ বলিলেন—"বাহিরের সাপ হ'চ্ছে অনন্তের ভাব, কুণ্ডলিনীর চিহ্ন। তারকা (star) মানুষের চিহ্ন; ক্রুস—খৃস্টের চিহ্ন, সম্পূর্ণটা সস্তিক বা শান্তির চিহ্ন, মধ্যে সূর্য—জ্ঞান, জ্যোতিঃচ্ছটা, তাঁর শক্তির, জল—কর্মের, হংস—রাজসিক, পদ্ম—ভক্তির, চন্দ্র—মুসলমান ধর্মের, নীচের লেখা—ওয়াহি আল্লা, অর্থে এক ভগবান বা আল্লা, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক ভিন্ন দ্বিতীয় নেই। সত্যই এক [২]। হংস—পরমহংস অবস্থার বা জ্ঞানযোগের চিহ্ন, সূর্য—পার্শীদের প্রতীক। এই প্রতীকটীর দ্বারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় থাকার সময় এটা এঁকেছিলুম। স্বামী বিবেকানন্দ মঠের প্রতীক এঁকেছিলেন। আর আমি সমিতির জন্যে এইটে এঁকেছিলুম।"

২৯শে কার্তিক শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। উ—বাবুর সহিত স্বামিজীর ঘরে গিয়াছি। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর জনৈক ব্রহ্মচারীর কথা উঠিল। তাহার পত্র দেখাইয়া স্বামিজী বলিলেন—"দেখ, বেটারা ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস নিয়েই মনে করে কি একটা হ'য়ে গেছি। তারা না থাক্‌বে গুরুর কাছে, না থাক্‌বে ভাল সাধুর কাছে। শিখবে না, জানবে না, সাধন ভজন কোরবে না, একটা আশ্রম কোরতে পারলেই হ'ল। আশ্রম করা বা লোকশিক্ষা দেওয়া কি মুখের কথা? সেই জন্যে আত্মদর্শন করা চাই; সিদ্ধিলাভ করা চাই। লোকশিক্ষা,—

---

১ বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।—গীতা—৭।১৯

২ একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।—ঋগ্বেদ।

বক্তৃতা কোরলেই হল ? নিজের অনুভূতি চাই। তা' না হ'লে তোর কথা শুনবে কেন ? আমরা সব বুঝি, সব দেখে পেকেছি, সিদ্ধ হয়েছি। আমরা এখন সব ভাল-মন্দ বুঝতে পারি। জগতের ভাল-মন্দ, কি হ'বে না হ'বে, বুঝতে পারি। তেমনি ভাবে তোদের বলি এ কর এ করিস্ না। তোরা তো তা শুনবি নে ? যেমন আমাদের কথা শুনবি নে, তেমনি কত কষ্টও পেতে হ'চ্ছে।—ও বেটা কি কম ভুগছে ? এর পর আরও ভুগবে। তুই তাকে লিখে দিস্। আমি ওর কাছে কিছু লিখবো না। আমি তার পত্র পেয়েছি জানিয়ে দিস্। গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হয়, তবে শিষ্যের কল্যাণ হয়। সাত জন্ম দেখা নেই, একখানা পত্র দিয়ে কৃতার্থ কোচ্ছে। গুরু যেন কেউ নয় অথচ গুরুই সব।"

৩০শে কার্তিক শনিবার ১৩৪২ সাল, ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৫

সকাল সাতটা। নানাকথার পরে স্বামিজীকে বলিলাম—"আজ কার্তিক পূজার দিন, আশ্রমে পূজা কোরলে মন্দ হয় না।"

স্বামিজী—"কাজ নেই।"

আমি—"কেন ? পূজা কোরলে এখানে ভাল ভাল ছেলে সব আসবে।"

স্বামিজী- "ভাল ছেলের কাজ নেই। যেগুলি এসেছে তাদের জ্বালাতেই অস্থির ! কোন বেটাতো সাধু হ'তে আসে না ; সব শেখাতে আসে।"

রাত্রিতে ঘরে অনেক লোক রহিয়াছে। সভা-সমিতির কথা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"কোথাও বক্তৃতা বা ক্লাস হ'লে মনটাকে বলি এঁর ভেতর নিবিষ্ট হ'য়ে যা ; অমনি একদম ওর ভিতর মন ডুবে যায়। কাণকে যদি বলি কোন শব্দ শুনিস নে, তা হ'লে সে আর কোন শব্দ শুনতে পায় না। চোখকে যদি বলি কিছু দেখতে পাবি নে, তবে আর কিছু দেখতে পায় না। মনকে বশীভূত কোরতে পারলে এরকম হয়। মন তো আমার কথা শুনতে

বাধ্য। চোখ, কাণের তো কোন শক্তি নেই? আমার শক্তিতেই তারা শক্তিমান। আমি যদি শক্তি ওদিকে না দিই তবে, ওদের কি শক্তি আছে যে শুন্‌তে বা দেখতে পায়।"

১লা অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৪২ সাল, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা হইতেছে। স্বামিজী বলিলেন—"তাঁর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস চাই, নতুবা কিছু হ'বার যো নেই। ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন তাঁকে বল্লুম তোমার তো শরীর নেই, তুমি অশরীরী। আমার এই দেহটা নিয়ে তোমার কাজ চালাও। এ শরীর আজ থেকে তোমার হ'য়ে গেল। তার পর হ'তে সর্বকাজে তাঁর ভাব মনে হয়। এঁর ভেতর যে ভাব ও কাজ হ'চ্ছে তা ঠাকুরের ভাব বলেই জানিস্। আমার বোলতে কিছু রাখিনি। বাস্তবিকই তো আমার আবার কি? তাঁকে সব সঁপে দিয়েছিলুম, শরীরটা পর্যন্ত। এখন ভাল-মন্দ কাজ-কর্ম, সব তাঁর ইচ্ছায় হ'চ্ছে। এতে ভণ্ডামি একটুও নেই জানবি। এর ভেতর তাঁর একটু শক্তি-টক্তি আছে—নতুবা এত লোকে মানে কেন? বড় বড় পণ্ডিত এসে মাথা নোয়ায় কেন? যাকে যা বলি মেনে নেয়।"

—"আমার বইগুলি সব পড়িস। তার ভেতর বেদান্ত বলিস, উপনিষদ বলিস সব আছে। এগুলির মধ্যেই ধর্মের সার পাবি, অন্য কিছু পড়তে হ'বে না।"

—"ভগবানের নামে যারা সবকিছু ত্যাগ কোরতে পারে, তারাই সব কিছু পেতে পারে। আমরা তো, শরীর, মন, সব তাঁকে দিয়েছিলুম। তবে তো তিনি আমাদের কৃপা কোরলেন। আমরা তাঁকে ফাঁকি দিইনি। তাঁর শরীর থাকতেও যেমন মেনেছি, এখনো তেমনি মেনে চলি। তখন যেমন আমাদের

তিনি দেখ্‌তেন, শুনতেন, এখনো তেমনি দেখ্‌ছেন, শুনছেন। ফাঁকি দেবার যো নেই।"

২রা অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪২ সাল, ১৮ই নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী বলিতেছেন—"আত্মাকে জানার নামই আত্মজ্ঞান। তোমার ভেতর যে আছে সেই আত্মা। তুমি তো শরীর নও? আত্মাকে জানার নামই আত্ম-দর্শন। তোমার শরীর তো দিন দিন পরিবর্তন হ'চ্ছে কিন্তু 'তুমি যে, সেই আছ। ছেলেবেলায় পড়াশুনা কোরেছ, খেলা কোরেছ, সব তুমি কোরেছ। তোমার শরীর তো বদ্‌লিয়ে গেছে। সেই শরীর আর এই শরীর দেখ; তা হ'লেই দেখ, শরীর আর তুমি আলাদা। বই-টই পড়ে আত্মজ্ঞান হয় না। ধ্যান ধারণা কর, সব বুঝবে। এ পড়ার দ্বারা হ'বার নয় [১]। সাধন করা চাই। বিচার কর; আমি শরীর নই, মন নই, হাত নই, পা নই—এই ভাবে। চিন্তা কর আর ধ্যান কর, তবে তো হবে?"

—"তুমি পরজন্মে যা হ'বে, তা এখন কোরে নিচ্ছ। তোমার কর্মের দ্বারাই তোমার জন্ম। তবে তোমার ইচ্ছা মত জন্ম হ'বার যো নেই। কর্মানুসারে হ'বে। তোমার বাসনা পূর্ণ কোববার জন্যে জন্ম-ধারণ। মুক্ত পুরুষদের জন্ম ইচ্ছামত হয়। আর শরীরের জন্ম হয়, আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই। গীতায় আছে, [২] যেমন জামা কাপড় ছিঁড়ে গেল বদ্‌লিয়ে নিলে। তোমার কি কিছু পরিবর্তন হ'ল? সেইরূপ, আত্মার পরিবর্তন হয় না। গীতাতে খুব জ্ঞানের কথা আছে। রোজ রোজ গীতা পড়া ভাল। অর্থ বুঝে পড়া চাই, নতুবা শ্লোক মুখস্ত কোরে কি হবে?"

১ নায়ং আত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।—কঠ উপনিষদ ১।২।২৩

২ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। গীতা ২য় অধ্যায়।

৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ১৯শে নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"তোমরা কোন কাজই অভ্যাস কর না। অভ্যাস [১] না কোরলে কি মন স্থির হয়? অভ্যাস কর, তবে ভাব স্থায়ী হ'বে। যখনই মনের উঁচু ভাব হয়, তখনই প্রত্যহ অভ্যাস কোরতে হয়, তা হ'লে ভাব পাকা হ'বে। জপ ধ্যান এসব অভ্যাস দ্বারা বাড়াতে হয় এবং মন উঁচুতে রাখতে চেষ্টা কোরতে হয়। এসব হলো অভ্যাস যোগ। সকলের কি হ'বার যো আছে? ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তি রেখে অভ্যাস কর, তা হ'লে এগুতে পারবে। পথ কঠিন [২]। মনের স্বভাব হ'ল বিষয়-বাসনা নিয়ে থাকা। পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা তাকে বশে আনতে হয়। অন্য উপায় জানলে তো বলবো? শরণাগত হ'য়ে প্রার্থনা কর, আর অভ্যাস কর। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, যাতে মন স্থির হয়। তোমার কথা তো তিনি শুনবেনই। তুমি তাঁর পূজারী, শুনবেন না? সকলের কথাই তিনি শুনবেন।"

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪২ সাল, ২০শে নভেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি দশটা হইবে। একটী ভক্ত উঠিয়া গেলেন। স্বামিজী বলিলেন—"দেখ, ও বেটা হিংসুক। হিংসে খুব খারাপ, ভীষণ বিষাক্ত জিনিষ। একজন হিংসেপরায়ণ লোকের সঙ্গে অন্য লোক থাকলে হিংসুক হ'য়ে যায়। হিংসে এমন সাংঘাতিক ও ছোঁয়াচে। পরীক্ষা কোরে দেখা গেছে,—একজন হিংসুক লোকের রক্ত নিয়ে বাইশজন লোক মারা যায়। হিংসে একটা বিষ কিনা? অন্যকে ঐ রক্ত নিয়ে ইনজেকশন দিলে সে মরে

১ অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

২ ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

যাবে। যে হিংসে ক'রে সে তো মারা যাবেই, আবার অন্য লোককে তার বিষ ছড়াবে। হিংসুক কি অন্যের সুখ দেখতে পারে? তার গা জ্বালা করে, সংসার তো এর হাত থেকে রক্ষা পায়ই না, আর দেখ কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত এর হাত এড়াতে পারেনি, ছারখার হ'য়ে গেছে। আমার এখানেই দেখনা কত বেটা তো সাধু হ'ল কিন্তু কয়জন এখানে আছে? সব অন্যের ভাল দেখতে না পেরে, নিজের পথ দেখেছে। তোরাই কি কম? এখানে যারা আছিস আমি সব বেটাচ্ছেলেদের জানি। কে কর্তা হ'বে তার জন্যে অন্যের ব্যথা লাগ্‌ছে। কিছু বলিনে তাই। বল্লে, সব বেটারা পালিয়ে যাবে।"

৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ২১শে নভেম্বর ১৯৩৫

সন্ধ্যা আরতির পর। সঙ্ঘের কথা উঠিল, স্বামিজী বলিলেন—"ইউরোপ, আমেরিকায় প্রচার হোচ্ছে অথচ বাংলাদেশের অনেক পল্লীতে এখনো ঠাকুরের বা স্বামিজীর নাম পর্যন্ত জানে না। এদের জন্যে ঠাকুর স্বামিজী কত ভেবেছিলেন। আর এরা তাদের জন্যে একটুও ভাবতে চায় না।"

—"এখন যা দেখছি আদর্শ থেকে অনেক নেমে গেছে, তবে তাঁর ইচ্ছে হ'লে আবার ঠিক ঠিক কাজ হ'তে পারে। এতো ঠাকুর স্বামিজীর মঠ। তাঁদের ইচ্ছে হোলে আবার কত ভাল ভাল তপস্বী হ'তে পারে। তাঁরা যেমন চালাবেন তেমনি চল্‌বে।"

৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ২২শে নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী বলিতেছেন—"সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। সে গৃহীই হোক্ আর সাধুই হোক্। যেসব মহাত্মারা নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে সংসার হ'তে ঊর্দ্ধে, সংসারাতীত

রাজ্যে বিচরণ করেন। মনে যার সংসার নেই, তার সংসার ত্যাগ হ'য়েছে। সুখ দুঃখ তো পেতেই হ'বে। আঘাত না পেলে কি গাছ শক্ত হয়? ঘাত-প্রতিঘাতেই তো জীবন তৈরী হয়। মনের শক্তিও বেড়ে যায়। ভালমন্দের সাথে লড়াই হ'ল জীবনের চিহ্ন। ওদেখে ঘাব্ড়ালে চলবে কেন?"

.৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৪২ সাল, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৫

পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। কাশীপুর হইতে নড়াইলের জমিদার রায়দের বাড়ী হইতে দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা মিডিয়মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা স্বামিজীকে বলিলেন। স্বামিজী বলিতেছেন—"দেখ আমি একসময়ে আমেরিকায় এ বিষয়ে জানবার ও শেখবার যথেষ্ট সুবিধে পেয়েছিলুম। একবার সাতহাজার লোকের সন্মুখে বক্তৃতা করেছিলুম। তাঁরা সকলেই এক এক দেশের পরলোকতত্ত্ববিদ, আমার বোল্বার বিষয় ছিল—পুনর্জন্ম ও পরলোকতত্ত্ব। তাঁরা আমার বক্তৃতা শুনে অবাক হ'য়েছিল। আমাকে তাঁদের দলের President ক'রে নিয়েছিল। তাতেই আমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম। অনেক পরীক্ষা কোরে দেখেছি। তাঁদের সঙ্গে আমিও বোস্তুম। মৃণালকান্তি ঘোষের পরলোকতত্ত্ব বইতে যে সকল ঘটনা আছে তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এ সব অস্বীকার কোরবার যো নেই। সত্যিই আত্মা আস্তে পারে। তবে, নিজের সাবধান থাকা দরকার, নতুবা অনেক সময় খারাপও হ'তে পারে। অনেক সময় ভূতপ্রেতও আসে। তাই আমাদের দেশে পূজাদি কোরবার সময় ভূতশুদ্ধি ক'রে নেয়, যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

—"তোমাদের চিন্তা এত গভীর কর্তে হ'বে যে সেই চিন্তাপ্রবাহ উপরের স্তরে পৌঁছুতে পারে। চিন্তারও অনেক স্তর আছে; সপ্তম স্তরে দেবতারা

থাকেন। সেখানে যদি তোমার চিন্তার গতি না পৌঁছে, তবে কি কোরে দেবতারা আস্‌বেন। চিন্তা গভীর হ'লেই তোমার প্রার্থনা দেবতারা শুনতে পাবেন।

—"তোমাদের তো অনেক সময় চলে গেছে। আর সময় নষ্ট করা কি ভাল? এ জীবনেই পরজীবনের জন্য প্রস্তুত হও। তুমিই তোমার জন্য দায়ী। এ জীবনে যা সাধন-ভজন কোরে যাবে এরপর থেকেই আবার আরম্ভ। শরীর যাবে কিন্তু আত্মা তো যায় না? চিত্তরূপে সংস্কারগুলি সব নিয়ে যায়[১]। যাঁরা ভাল কাজ করেন, তাঁরা মরে গেলেও ভাল করেন। জন্ম হোক্ আর নাই হোক্। আর যারা খারাপ কাজ করে তারা মরেও অন্যের অনিষ্ট করে। জন্ম তো তার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। জন্ম মৃত্যু নিজের ইচ্ছায় হয় না। মরে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার জন্ম হ'বে, তার কোন মানে নেই। বহু বৎসর পরেও জন্ম হ'তে পারে। ভোগ-বাসনা প্রবল থাক্‌লে শিগ্‌গির শিগ্‌গির জন্ম হয়। সকলেই উপরের স্তরে যেতে পারে না। এই ধরনা যারা ঠাকুরের চিন্তা করে, তারা মরে রামকৃষ্ণ লোকেই যাবে। আর যারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে তাঁরা বৈকুণ্ঠে যাবে। এইরূপ যে যেদেবতার ভজনা করে, সে সেই লোকে যাবে[২]। প্রত্যেকের ঘর আলাদা। উপরের স্তরের আত্মা নিম্ন স্তরে আস্‌তে পারে; কিন্তু নিম্ন স্তরের আত্মা উপরের স্তরে যেতে পারে না। এগুলি ঠিক। আমি জানি; অনুভূতি না হ'লে এসব ঠিক বলা বা বুঝা কঠিন।"

১ শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ গীতা ১৫।৮

২ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ গীতা ৮।৬

৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪২ সাল, ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"ঠাকুরের ভাব বর্তমানে লোকে খুব পছন্দ করে। কোরবেই, কারণ এত উদার ভাব আর কি হ'য়েছিল? ধর্ম যত উদার হ'বে, তত লোকে গ্রহণ কোরবে। ঠাকুরের ভাব যাতে প্রচার হয়, তার জন্যে তোদের চেষ্টা করা উচিত। এতে লোকে শান্তি পাবে। তবে যারা লোক-শিক্ষা দেবে তাদেব আত্মদর্শন করা দরকার। যারা আত্মদর্শন না কোরেছে তারা কি কিছু অনুভব কোরেছে, যে বোলবে? আমাদের এবিষয় বোলবার অধিকার আছে। ঠাকুর আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এই যে দেখ্‌ছিস ঠাকুরের ভাব প্রচার হ'চ্ছে, স্বামিজীব আর আমার বই মুখস্ত কোরে তো? আর কেউ কি অনুভব কোবেছে? যে ঠিক ঠিক অনুভব কোরেছে, সেই লোক-শিক্ষা দিতে পারে। নতুবা পারবে কেন? ঠাকুবের সন্তানেরা লোক-শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ।"

১৬ই অগ্রহায়ন সোমবার ১৩৪২ সাল, ২রা ডিসেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি দশটা। একটী ভক্ত সঙ্গে আছেন। যাইতেই, স্বামিজী বলিতেছেন,—"কিগো? খবর কি? এই দেখ মন্দিরের নক্সা। তুমি তো এসব বেশ বুঝতে পার। এসব জায়গায় ঠাকুরের খুব যাতায়াত ছিল। এখানে তাঁর মন্দির হ'লে বেশ হ'বে, কি বল?"

তার পর বলিতেছেন—"আমরা তাঁর দাস, তিনি ইচ্ছে কোরলে এমন কত মন্দির কোরতে পারেন। এরই ভেতর তাঁর জগত-জোড়া কাজ দেখে অবাক হয়েছি। তিনি বোলতেন—"ভগবানকে প্রচার কোরতে খবরের কাগজের দরকার হয় না"। আমরা তো তাঁর হাতের পুতুল। তিনি শক্তি না দিলে কি কিছু কোরতে পারি? নিজের অহঙ্কার এলেই সব পণ্ড হ'বে। আমি আশ্রম কোরছি, আমি মন্দির কোরছি, এভাব ভাল নয়। এতে

কাজে কৃতকার্য হওয়া যায় না। তুমি কি কিছু সংকল্প করে কাজ কোরতে পার? নিজে কোর্‌লে হয়ত সবই উল্‌টে যাবে।"

১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪২ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৫

উপরে গিয়া দেখিলাম সেবককে বলিতেছেন—"এই সামান্য কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে কোরতে পারিস্‌নে, তো বড় বড় কাজ কি কোরে কোরবি? যার সেবা কোরবি তার যদি কষ্টই হ'ল তো সেবার ফল পাওয়া যাবে কি করে? নিষ্ঠার সহিত ভগবানের সেবা, সে কি কম নাকি? সেবাতেই ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে।"

২৩শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪২ সাল, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

সকাল দশটা হইবে। কলিকাতায় কংগ্রেসের সভা হইতেছে। সেই সম্বন্ধে স্বামিজী বলতেছেন—"কংগ্রেসের আদর্শ ভাল, কিন্তু এদের অনেকে হুজুগে হ'য়ে পড়েছে। অনেকের আসল বস্তুর দিকে দৃষ্টি নেই। তোদের ও-সব পথ নয়। তোরা সন্ন্যাসী। তোদের কর্তব্য সাধন-ভজন সঙ্গে রেখে জনসাধারণের সেবা করা; তাতে অহঙ্কার বা কর্তৃত্ব-বুদ্ধি হয় না। শুধু বক্তৃতা দলেই হয় না। মুখে বোলছে এটা তোমরা কোরোনা, কিন্তু কাজে নিজেই তা করে বেড়াচ্ছে। এমন হ'লে লোকে শুন্‌বে কেন? যে ত্যাগী হয় তার কথাই লোকে শুনে। ঠাকুর বোলতেন—"মন মুখ এক হওয়া চাই, তবে হ'বে।"

—"বাপ ছেলেকে শেখাতে পারে না কেন? বাপ নিজেই সৎভাবে থাকবে না, ছেলের কি দোষ? নিজে ভাল হ'লে তখন আর ছেলেকে বোলতে হয় না, তুমি ভাল হও; তখন ছেলে আপ্‌সে-আপ্ ভাল হ'বে। তুমি নিজে সাধু হও, তোমার দেখাদেখি আরও কত লোকে সাধু হ'বে।

তোরা চাস্ নিজে ভাল না হ'য়ে অন্যকে ভাল কোরতে [১]। তা কি হয়? ধাপ্পা দিয়ে কয় দিন চলে। একদিন না একদিন নিজের স্বরূপটা প্রকাশ হ'য়ে পড়বেই।"

২৪শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

ভোগবাসনার কথা আলোচনা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"জগৎ কি সৎ বিষয় সহজে নিতে চায়? কেন নেবে? তারা তো চায় ভোগ। ত্যাগের কথা শুনলেই ভয় পায়। এই জন্যেই ঠাকুর মাষ্টার মশাইকে দিযে কেমন সংসারীদের উপযোগী বই লিখিয়েছেন, ও সংসারীদের বেদ-পুরাণ। সন্ন্যাসীদের কথা বড় একটা পাবে না। আমাদের যখন কিছু বোলতেন তখন দেখ্তেন বাইরের কেউ আছে কিনা। সন্ন্যাস তো সাধারণের জন্য নয়?

—"বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এরা সব আদর্শ সন্ন্যাসী। অন্যান্য যুগেও ধর্মের আচার্যেরা অধিকাংশই সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসী মানে ত্যাগী। ত্যাগী না হ'লে তার কথা লোকে শুনতে চায় না। যুগে যুগে ধর্মাচার্যেরা ত্যাগী সন্ন্যাসী হ'যে লোকশিক্ষা দেবার জন্যে আসেন। গৃহীরা ধর্মের বিনিময়ে সাধুদের ভরণ-পোষণ কোরবে। ঠাকুর স্বামিজীই তো নতুন ভাবে বল্লেন যে সন্ন্যাসীরা সমাজের কল্যাণের জন্যে, পরের উপকারের জন্যে জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ কোরবে। কবে এসব ভাবের সন্ন্যাসী ছিল? এর পরে দেখবি এ ভাব-ধারা সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়বে। এখনই দেখছিস্নে, দশনামী সন্ন্যাসীরাও [২] দু-একটা বিদ্যাপীঠ, ঔষধালয় কোরে সমাজের সেবা

১ চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। "বিবেকানন্দ"

২ শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীরা—গিরি, পুরী, আশ্রম, সরস্বতী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর, তীর্থ—এই দশটী নামে বিভক্ত। এইজন্য এদের দশনামী সন্ন্যাসী বলে।

কোরছে। ওরা তো বেদান্তবাদী, বলে কিনা নৈষ্কর্ম্ম হ'তে হ'বে; তাই কর্ম্ম ত্যাগ। পরার্থে এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে নয়। এ হ'ল যোগ সাধনা।"

২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪২ সাল, ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

রাত্রি সাড়ে নয়টা। স্বামিজী খবরের কাগজ পড়িতেছেন। প্রণামান্তে বসিলাম। সমিতির কাজ-কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগের বিভূতির কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"বিভূতি দিয়ে কি হ'বে! তাতে কি ভগবান পাওয়া যায়? আমরা বিভূতি-টিভূতি জানিনে। ঠাকুরের নিষেধ আছে। মঠে দেখ্‌না, বিভূতির জন্যে কারও চেষ্টা পর্য্যন্ত করা নিষেধ। স্বামিজী নিজে বারণ কোরে গেছেন। যোগের গ্রন্থাদি পড়লে এসব অনেক বিভূতির বিষয় জানা যায়। ব্রহ্মচর্য্যপালন না কোরলে, অষ্ট প্রকার মৈথুন ত্যাগ কোরতে না পারলে, যোগে অধিকারই হয় না।—দর্শন, শ্রবণ, মনন, কথন, স্পর্শ, কেলি, সংকল্প, সম্ভোগ এই অষ্ট প্রকার মৈথুন [১]। তোরা কি পারিস সবগুলি পালন কোরতে? আমরা সাধন সময়ে এসব মেনে চলতুম। স্ত্রীলোকের মুখ কখনো দেখতুম না। ভিক্ষেয় গেছি তবু দর্শন কোরতুম না। মাটির দিকে চেয়ে পথ চলতুম। সাধনকালে এসব ঠিক ঠিক মেনে চলতে হয়—বিশেষ কোরে সাধুদের।

—"তুই তো সেদিন স্বপ্ন দেখেছিস্। ঠাকুরের কথা মেনে চল্‌বি। "মহাপাপ করিস, তবুও স্ত্রী-সঙ্গ করিস নে।" সাধুদের ওর চাইতে বড় পাপ আর নেই। গৃহস্থ তো স্ত্রী ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে আসেনি? এসব

১ শ্রবণং কীর্তনং, কেলি প্রেক্ষাণং গুহ্যভাষণং
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রীড়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যং অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।

জন্যেই তো সন্ন্যাস খুবই কঠিন। সান্যালমশাই সন্ন্যাসীর নিয়ম মান্‌তে না পেরে বাড়ী চলে গেলেন। তবুও আদর্শকে ছোট করেননি।"

২৬শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"গৃহস্থের বড় দুঃখ। বলে একটা উপায় কোরে দিন। উপায় তো তোমাদের নিজের হাতেই রয়েছে? তোমরা তা মেনে চল্‌বে না তো দুঃখ পেতেই হ'বে। সংসারে থাকতে বোলেছেন, তা ব'লে শাস্ত্র বলে দেননি যে তোমরা সংসারে জড়িয়ে পড়। জ্ঞান নিয়ে সংসার কর না? দেখ্‌বে তোমাকে দুঃখ কিছু কোরতে পারবে না। সুখ-দুঃখ তো সংসারে থাক্‌বেই। এসকল অনন্তকালই আছে। এরই ভেতর ভগবানের নাম কোরতে হয়।"

—"অনুকূল কি? তাঁর নাম কোরতে কোরতে তিনিই সব অনুকূল করে দেবেন। ভগবানকে না জান্‌লে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। তোমরা ভগবানকে ভুলে থাক্‌বে তো হ'বে কি? অনেকে আবার তাঁকে বিশ্বাসই করে না, তো ডাক্‌বে কি? সৎসঙ্গ কোরলে সৎভাবগুলির বিকাশ হয়, আর অসৎসঙ্গ কোরলে অসৎ ভাবেরই বিকাশ হ'বে। তোর মনে সৎ অসৎ দুই ভাবই রয়েছে [১]। যে টার চর্চ্চা কোরবি, সেই টাই বেড়ে যাবে। মনের সৎভাবের সাধন কর, মনের শক্তি বেড়ে যাবে। দেখ্, আগে কোনটা তোর চাই। একটা ঠিক কোরে তাতে লেগে যেতে হয়।

—"সকলেই কি অবতারদেব দেখে বিশ্বাস কোরবে না কি? তখন কি বিশ্বাস হয়? কত লোকতো ঠাকুরকে দেখেছে। কয়জন তাঁকে ভগবান

১ চিত্তনদী নামোভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ।

—পাতঞ্জলি যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য ১।১২

ব'লে বুঝেছিল? বড় জোর কেউ সাধু, কেউ পরমহংস ব'লেই তাঁকে মান্‌তো। আমরাই কি তাঁকে বিশ্বাস করতুম? তিনি আমাদের বার বার বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে বিশ্বাস করিয়েছেন। তোরা তো আমাদের কাছে শুনে বুঝবি। এতেও যদি তোদের বিশ্বাস না হয় তো কোন কালেই হ'বে না। আমরা তাঁকে কত পরীক্ষা কোরেছি। তবে তো এখন অনেকে তাঁকে মান্‌ছে, বিশ্বাস কোরছে।"

২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

আরতির পর দুইটী ভক্ত বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সংসারের দুঃখ-দৈন্যের কথা হইতেছে। একজনের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। তাহাকে স্বামিজী বলিতেছেন—

"স্ত্রী মরেছে দুঃখ কি? ছেলেমেয়ে আছে তো? একটা ঝি চাকর রেখে দাও। সে মরেছে, তা আমরাও তো মরবো। কেউ আগে আর কেউ পরে বইত নয়? মনটন খারাপ কোরবে না, শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে। তোমার তো অফিস আছে। এভাবে কয়দিন চল্‌বে। সংসার তো বুঝে নিলে, এখন বিয়ে-টিয়ে না কোরলেই ভাল। ভগবানের কাছে স্ত্রীর কল্যাণ কামনা কোরবে। তাকে ভালবাসতে, তার জন্যে প্রার্থনা করা তোমার কর্তব্য। সেটা তুমি কোরবে। দেখ্‌লে তো, এই ছিল আর এই নেই। তাই বোলছিলুম এখনও সময় আছে ভগবানকে একটু ডাক টাক। তা যদি ভগবান নাই মান, তাতেই বা দোষ কি? যাঁকে মান তাঁকেই ডাক। যারা ভগবান মানে, তারা তাঁকে লাভ করুক, আর নাই করুক, ভজনাদি করার জন্যে তো মনে শান্তি পায়। মনে শান্তি, একি কম কথা? নাইবা পেলে ভগবান, সুখে শান্তিতে তো সংসারে থাকতে পারে। সেটাই লাভ, কি বল?" (হাস্য)।

২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৪২ সাল, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

দীক্ষাদি খুব হইতেছে। দীক্ষার বিষয় বলিতেছেন—

"সদ্‌গুরু হ'লেই কেবল হয় না। ভগবান্‌কে উপলব্ধি কোরতে হ'লে, শিষ্যের খাটুতে হয়। শিষ্য যদি কায়-মনোবাক্যে সৎ হয়, তো তাঁর কৃপা হয়? শিষ্য তখন কৃতার্থ হয়। নতুবা আমি ব'লে দিলুম এই এই কর; তুমি তা মান্‌লে না, সংযম পালন কোরলে না, তো হ'বে কি? যোগ ও কোরব, ভোগও কোরব, এ হয়না বাবা। আমরা তো তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা কচ্ছিই, এখন তোমরা যদি অধিকারী না হও, তো আমরা কি কোবব। ঠাকুর বোলতেন—"ঘরে যদি আলো আন্‌তে চাও, তো ফুটো বা জানালা দরজা রাখতে হ'বে।" বিবেক বৈরাগ্য আন্‌তে হয়; তবে ভগবানের প্রতি ভালবাসা আসে। বিচার কর—সৎ-অসৎ বিচার সর্বদা কোরবে। সৎভাবে সংসারে থাকবে। ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকবে। তোমরা নিজেরাই তো অনেক অনর্থ ঘটিয়ে সংসাবকে বিষময় কোরে তুলছ। ভগবানের আর দোষ কি?"

২৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৪২ সাল, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

আরতির পর স্বামিজীর ঘরে অনেক ভক্ত। অনেকেই নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। একজন গৃহস্থভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"দেখ, আদর্শ গৃহী হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়াও কঠিন। তোমরা মনে কর সাধুরা বেশ আছে। আবার সাধুরাও মনে করে, গৃহস্থের তো কোন অসুবিধে নেই? তারা ইচ্ছা কোরেই অশান্তি ভোগ কোচ্ছে, কিন্তু তা নয়। যে যার কর্মফল ভোগ করছে।"

একজন গণেশ দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামিজী বলিতেছেন—"গণেশের বহু নাম, তন্ত্রে গণেশের পঞ্চাশটী নাম দেখা যায়; তাতে

আবার পঞ্চাশটা শক্তিরও উল্লেখ আছে। আমাদের দেশে সব মূর্তি পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে অনেক নূতন নূতন প্রতিমূর্তি পাথরে খোদাই করা দেখা যায়। যোসীমঠে গণেশের দু-একটা সুন্দর মূর্তি আছে। কেদার-বদরীর পথেও অনেক মূর্তি দেখা যায়। গণেশ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।"

৩০শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪২ সাল, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী নীচে বেড়াতে আসিয়াছেন। কাঠের কাজের ঘরে গিয়া সব দেখাশুনা করিয়া বলিতেছেন—"তোরা আর কি Carpentery জানিস? আমি তোদের শেখাতে পারি। আমার কাছে এখনো সব যন্ত্রাদি আছে। আমি সব শিখেছিলুম। নিজহাতে জুতো তৈরী করে পরেছি। এখনো পরি। ফটো তুলতে পারি। হাতে তোলা ফটো এখনো আমার কাছে আছে। সব শিখতে হয়। গান গাইতে পারি। আমরা তো স্বামিজীর (বিবেকানন্দ কাছে গান বাজনা শিখেছি। আমি তবলা বাজাতে বেশ পারতুম। শরৎ মহারাজ পাখোয়াজ বেশ বাজাতো। স্বামিজী তানপুরা নিতেন, শরৎ মহারাজ পাখোয়াজ নিতেন; তবে গান জমতো। সে একদিন গেছে! এখন তো ওরকম জলসাই দেখিনে।"

৭ই পৌষ সোমবার ১৩৪২ সাল, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

সমিতিতে কয়েক জনের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হইবে। তাই স্বামিজী বলিতেছেন—

"যারা ব্রহ্মচর্য ব্রত নেয় অথচ সংযম পালন করে না, তারা কত হতভাগ্য। শিষ্য যদি ভাল হয়, তবে দীক্ষাদি দিতে আনন্দ হয়।—ওকে দেখনা, কামুক ব'লে মনে হয়। সংযমী হ'লে তার চরিত্র বদ্‌লিয়ে যায়।"

৯ই পৌষ বুধবার ১৩৪২ সাল, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

অদ্য কয়েকজনের ব্রহ্মচর্য। স্বামিজী ডাকিয়া বলিলেন—

"আজ ঠাকুরের বিশেষ পুজো কোরবি। হোম হ'বে।"

বেলা দুই ঘটিকায় স্বামিজী নীচে নামিলেন। ঠাকুর ঘরে দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন। দীক্ষার্থীদের বলিলেন,—"আজ তোদের নূতন জীবন হ'বে। এখন থেকে নৈষ্ঠিক ভাবে থাক্‌বে। দেখো, আমায় যেন খেলো কোরোনা।"

আসনে বসিয়া হোমে আহুতি দিলেন। তৎপরে কয়েকজনকে নিজে মন্ত্র বলিয়া আহুতি দেওয়াইলেন। তিনজন ব্রহ্মচর্য নিলেন। একজনকে আশীর্বাদ করিলেন—"বিবেক বৈরাগ্য হোক।" আর একজনকে আশীর্বাদ করিলেন—"বিশ্বাস ভক্তি হোক।" আর একজনকে আশীর্বাদ করিলেন—"তোমার ইষ্ট দর্শন হোক।" রাত্রিতে বলিলেন—"রোজ রোজ ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কোরবি। ইষ্ট মন্ত্র জপ কোরবি। দুই কোরতে হয়। আগে প্রাণায়াম, তারপর গায়ত্রী জপ, তারপর ধ্যান কোরতে হয়। খুব নিষ্ঠার সহিত কোরবি, তাতে মন স্থির হ'বে।"

১০ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"অজপা জপ [১] মানে চব্বিশ ঘণ্টা প্রতিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ করা। এখুব অভ্যাস না কোরলে হবার যো নেই। এতে মনের বাজে চিন্তা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। আর প্রেম হয়, ভগবানের জন্যে কাঁদলে। তাঁকে ভালবাসতে হ'বে। প্রথম বিশ্বাস, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তবে তাঁতে ভালবাসা হয়। একান্তে ব'সে তাঁর জন্যে কাঁদ। আগে দেখ ভগবানের জন্যে

---

১ সৎগুরু মালা মন দিয়া পবন স্বরতি সো পোই।
বিনাহাত নিশি দিন জপৈ মরম জাপয়ু' হই।—দাদু

তোমার অভাব বোধ হ'চ্ছে কিনা। যেমন জলপিপাসা পেলে জল পাবার জন্যে চেষ্টা কোরতে হয়, তেমনি তাঁর জন্যে পিপাসা হ'লে, কাঁদা যায়, নতুবা কি চেষ্টা কোরে কাঁদা যায় ?

সৎ-স্বরূপ ভগবানকে পেতে হ'লে সৎ চরিত্র, সত্যবাদী হ'তে হ'বে। ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে রাখতে হ'বে। সত্য বোলতে বোলতে মনের ময়লা কেটে গিয়ে মনরূপ দর্পণ নির্মল হ'য়ে যায়। তখন যা সংকল্প কোরবে তাই সফল হ'বে। তখন তোর কথা মিথ্যে হ'বে না। যাকে যা বোলবি তাই ফলে যাবে। সত্যের শক্তি অসীম।"

১১ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"তোকে তো মনের সম্বন্ধে অনেক কথা বোলেছি। আর কত বোলবো ? চেষ্টা না কোরেই বোলছ কিছু হ'ল না। হ'ল না তো আমি কি গুলে খাইয়ে দেব ? চেষ্টা কোরতে কোরতে, তবে ধীরে ধীরে হ'বে। ধ্যান কোরবার সময় মন এদিক ওদিক থেকে গুটিয়ে এনে তবে ইষ্ট মূর্তিতে লাগাতে হয়।[১] এতো বোলেছি অভ্যাস কোরতে হ'বে। এভাবে অভ্যাস কর, দেখবে মনের চঞ্চলতা কমে যাবে। ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কোরবে, তিনি যাতে মন স্থির কোরে দেন। এতে মনে শান্তি আসবে। সাধন ভজনে যথার্থ শান্তি আসে।"

১২ই পৌষ শনিবার ১৩৪২ সাল, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"উপনিষদের কি বুঝবি ? এতে কেবল ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ ; কি কোরে ব্রহ্মকে জানা যায়, এ সংসারের সুখ-দুঃখ জয় করা যায়, এই সব।

১ যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গীতা ৬।২৬

ব্রহ্মকে জেনে সে ব্রহ্মময় হ'য়ে যায়,[১] তাঁর আবার শোকই বা কি মোহই বা কি। ব্রহ্ম, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁর শোকও হ'তে পারে না, মোহও হ'তে পারে না। এই ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে কিছুই হয় না। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নির শক্তি তার কাছে কিছুই নয়। ব্রহ্মের শক্তিতেই এরা শক্তিমান। এই জন্যেই নচিকেতা আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার জন্যে সমস্ত সুখ ত্যাগ কোরে যমের কাছে গেছল। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ কোরতে পারলে কিছুই চাওয়া পাওয়ার থাকে না। তখন সমস্ত জ্ঞান তাঁর লাভ হয়।"

১৩ই পৌষ রবিবার ১৩৪২ সাল, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"ভক্ত আর জ্ঞানীতে তফাৎ আছে বৈ কি? ভক্ত চায় ভগবানকে দ্বৈত ভাবে উপলব্ধি কোরতে, আর জ্ঞানী চায় অভেদ জ্ঞানে তাঁকে পেতে। তাঁতে মিশে যাওয়াই হ'ল জ্ঞানীর চরম লক্ষ্য। জ্ঞানীর ভেদ দৃষ্টি নেই। সব অভেদ জ্ঞান। আর, ভক্ত-প্রেমিক ভেদ-দৃষ্টি ছাড়তে পারে না। তা হ'লে তো তার আনন্দ পাওয়াই হ'ল না। অবশ্য চরম পরিণতি উভয়েরই এক। ভক্ত ভোগ কোরে তবে ত্যাগ কোরবে, আর জ্ঞানী বিচার কোরে ত্যাগ কোরবে—এই তফাৎ। জ্ঞানী সর্বত্র সমদর্শী হ'বে। সবই ভগবানের বিরাট রূপ দেখবে। ভক্ত বিভিন্নরূপে ভগবানকে দেখে। ঠাকুর যেমন বোলতেন—"ইতি মার্গ আর নেতি মার্গ।" দুইই এক অবস্থায় পৌঁছুবে। সব নদীগুলি এসে এক সমুদ্রেই পড়ছে। সমুদ্রকে ব্রহ্মস্বরূপ মনে কর। অনন্ত সমুদ্র, অনন্তের ভাব জাগিয়ে দেয়। খুব উঁচু স্থানে উঠলে, আর সমুদ্রের ধারে গিয়ে বোসলে অনন্তের ভাব আপনিই এসে যায়।"

---

১ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—উপনিষদ

১৪ই পৌষ সোমবার ১৩৪২ সাল, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"যে কোন স্থানে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করা যায়, তবে হৃদয়ে আর ভ্রূমধ্যে ধ্যান প্রশস্ত। যোগী সাধকরা চক্রে চক্রে পদ্মের উপর বিভিন্ন দেব দেবীর ধ্যান করে। নিজের ইষ্টমূর্তি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে ধ্যান কোরবে। প্রথম মনে মনে একটা পদ্ম কল্পনা কোরে নিস। তারপর সেই পদ্মের উপর ইষ্ট ব'সে আছেন, জ্যোতির্ময় মূর্তি, এরূপ ধ্যান কোরবি। একান্তমনে তাঁর ধ্যান কোরবি। মূর্তি চিন্তা কোরতে কোরতে মন স্থির হ'য়ে যাবে। নির্জন স্থানে বোস্‌তে হয়, নতুবা প্রথম প্রথম বাইরের শব্দ এসে মন চঞ্চল কোরে দেয়। তোকে তো আগেই বোলেছি, এখানে ব'সে তোর ধ্যান-ধারণা হ'বে না। তুই কল্যাণানন্দের ওখানে গিয়ে থাক।" হাস্য।

১৫ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

স্বামিজী—"তোরা সাধু, গৃহস্থের অনুগ্রহ চাইবি কেন? তাদের কাছে ডাল রুটি ভিন্ন কিছু নিতেই নেই। টাকা আর স্ত্রী ছাড়তে না পারলে, সে আবার সাধু কিসের? গৃহস্থ যদি বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ না কোরতে পারে, তা হ'লে সেও গৃহস্থ নয়। সে তো ভোগী। পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের করা উচিত। এতে তাদের পাপ ক্ষয় হয়। পঞ্চযজ্ঞ হ'ল—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ আর নৃযজ্ঞ। উত্তর দেশে এসব এখনও অনেককে কোরতে দেখা যায়। আমাদের বাংলা দেশে ব্রাহ্মণেরাও এসব করে না। সাধে কি গৃহস্থের অধঃপতন হ'য়েছে? আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ সাধু, একই থাকের লোক।"

—"ঠাকুরের আশ্রয় যারা নিয়েছে তাদের কল্যাণ তো হ'বেই। সে গৃহস্থই হোক্ আর সন্ন্যাসীই হোক্। অবতার মহাপুরুষদের আশ্রয় নিয়ে পড়ে থাক্‌লে মরবার আগে হ'লেও শান্তি লাভ সে কোরবেই। তবে

কর্মফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কৃপা হয় না। মহাপুরুষদের কৃপায় সাত জন্মের ভোগ এক জন্মেই কেটে যায়। ঠাকুরের আশ্রয়ে না থাক্‌লে হয়তো আরও অধঃপতনের সীমায় পৌঁছুতিস্।"

১৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজীর ঘরে যাইতেই বলিলেন—"কিরে কেমন আছিস, খবর কি? আনন্দ-টানন্দ পাচ্ছিস্ তো? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের মত সব নিয়মগুলি মেনে চলিস্। গুরুকে স্মরণ কোরে, হাতে গায়ত্রী জপ করিস্, তারপর প্রাণায়াম কোরে নিয়ে ঠাকুরের গায়ত্রী কোরবি। তারপর মূলমন্ত্র জপ কোরবি, যতটা পারিস ধ্যান করিস। জপ ধ্যান কোরবি, তা হ'লে আনন্দ পাবি। না হলে কি হ'বে? ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস নিয়ে যদি কিছু না করে, তবে কি হ'বে?"

—"কাল ঠাকুরের বিশেষ পূজো কোরেছিস তো? কাল ঠাকুরের কল্পতরু দিবস গেল। আমার মনে ছিল না ব'লে তোরা কি মনে কোরে দিতে পারিস নি? নানাকাজে থাক্‌তে হয় ব'লে ভুলে যাই। এসব পালন করিস, এসব কোরতে হয়। সব মহাপুরুষের তিথি পালন করিস। এরপর সব তিথিতে আমায় বোলবি। আমি টাকা দেব, অন্ততঃ ঠাকুরের ভোগে সেদিন দুটো ফল এনে দিতে হ'বে এবং যাঁর তিথি থাক্‌বে তাঁর নামে একটা নৈবেদ্য নিবেদন কোরে দিস্। ঠাকুর এগার জনকে বিশেষ নামে আখ্যা দিতেন। এঁদের ফুল-চন্দন দিলে মঙ্গল হ'বে। আমি পূজো কোরতে গেলে সকলকেই এক একটা ফুল দি, তবে পুজো করি। গৃহস্থদেরও (যারা মঠে ও মিশনে মন্ত্র নিয়েছে) উচিত তাঁদের তিথি পালন করা। সকলকে নিয়েই ঠাকুর। এঁদের বাদ দিলে ঠাকুরের কথাই মানা হয় না। তিনি বোলতেন—"আমি পূর্ণ আর আমার ছেলেরা অংশ।"

—"তুই যখন ধ্যান কোরবি বা পূজো কোরবি তখন একটা পদ্ম চিন্তা কোরবি, তার বারটা পাপড়ি থাক্‌বে, তার প্রত্যেক পাপড়িতে এক এক জন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বোস্‌বেন আর মধ্যে ঠাকুর, এইরূপ চিন্তা কোরে এক একটা ফুল দিবি ; তোর কল্যাণ হ'বে, এঁরা ঠাকুরের অংশ। এঁদের পুজোয় ঠাকুর সন্তুষ্ট হ'বেন।"

১৮ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৬

রাত্রি এগারটা। একজন গৃহস্থ সেবক বসিয়া আছেন। স্বামিজী বলিতেছেন—"ভগবানের স্মরণ-মনন কোরতে থাক্। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব অবস্থাতেই কল্যাণ হ'বে। এর জন্যে বৈরাগী সাজতে হ'বে না। তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গেই থাক, আব নিবৃত্তি-মার্গেই থাক, যে কোন অবস্থায়ই থাকনা কেন তাঁর নাম কোরতে কোরতে সব হ'বে। বিশ্বাস কর, আমি বোল্‌ছি হ'বে। সংসারের অভাব অভিযোগ সব তাঁকে জানাবে। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ই.চ্ছতে সব হ'তে পারে।"

২০শে পৌষ রবিবার ১৩৪২ সাল, ৫ই জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী কয়েকজন গৃহস্থ ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"ভগবানের উপর ভার দিয়ে সংসার কোর্ত্তে হয়। ভগবান যা করেন ভালর জন্যে, এইরূপ বিচার কোরতে কোরতে দেখ্‌বে, তখন তুমি নির্বিকার হ'য়ে যাবে। কোন দিক দিয়েই তোমায় বিচলিত কোরতে পার্‌বে না।"

২১শে পৌষ সোমবার ১৩৪২ সাল, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"বেদতো চার খানি। এক এক বেদের এক এক মহাবাক্য আছে। যথা—তত্ত্বমসি ; প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম এবং অহং ব্রহ্মাস্মি।

এইগুলির অর্থ—আমিই ব্রহ্ম, পরিপূর্ণভাবে ব্রহ্ম, জ্ঞানই ব্রহ্ম। জ্ঞান হ'ল ব্রহ্মের স্বরূপ। তত্বমসি সোহং মানে—আমিই সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, আমি সেই অর্থাৎ ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম ভাবতে ভাবতে নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হ'য়ে যায়। এ অহঙ্কার নয়। শরীর সম্বন্ধীয় যে সকল ভাব, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সব ঘটনা ঘটে, তাতে অহঙ্কার হয়। এতো ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার কথা বোলছে। এ হ'ল বিশুদ্ধ বেদান্ত। ত্রিগুণাতীত অবস্থার কথা। শরীর নই, মন নই, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করা; এ কঠিন, খুব কঠিন।"

২২শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪২ সাল, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"কি গো? আজ আবার কি? রোজ রোজ তো বিরক্ত কোরতে আসছিস্। আমার বই-টই পড়, ওর ভেতর সব আছে।—বুঝবে কি? মূর্খ হ'লে কি কিছু বুঝা যায়? লেখাপড়া শেখ। যত সব মূর্খ এখানে এসে জুটেছে!" বিভিন্ন আলোচনাদির পরে স্বামিজী বলিতেছেন—"তোদের সে বিশ্বাস কই, যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস কোরে পড়ে থাক্‌বি? এইজন্যে একটু লেখাপড়া কোরতে হয়। সে রকম বিশ্বাস হ'লে কোন বই পড়ার দরকারও হয় না। এক কথায় জ্ঞান হ'তে পারে।"

—"মন স্থির হ'ল না—বল্লেতো হয় না? এ সব হতাশের কাজ নয়। কি চেষ্টা ক'রেছিস? কয় ঘণ্টা ধ্যান ক'রেছিস? দু ঘণ্টা? আমরা রোজ বাইস ঘণ্টা ভগবানের চিন্তা ক'রেছি। আর তোরা বাইস ঘণ্টা বাজে চিন্তা কচ্ছিস্ তো হ'বে কি করে? তোরা ছয় ঘণ্টা ধ্যান কর দিকিনি? তাতে হয়ত মাথা ঘুরে পড়বি। আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ছয় ঘণ্টা ধ্যান-ধারণা কর, তবে কিছু হ'বে। যে যত বেশী সময় ভজনাদি কোরবে তার তত শিগ্‌গির মন স্থির হ'বে।"

২৩শে পৌষ বুধবার ১৩৪২ সাল, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"ভক্তি একই। তবে যদি বল শাস্ত্রমত কি, তবে প্রধানতঃ নয় প্রকার। আর সাধন-ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ আছে। প্রধান নয় প্রকার হ'ল—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন। শ্রবণ—ধর্মশাস্ত্র সৎগ্রন্থ প্রভৃতি শুনতে হয়। ভগবানের বিষয় শুনার নামই শ্রবণ। কীর্তন—ভগবানের নাম, লীলা, গুণ-মহিমা এই সব উচ্চস্বরে উচ্চারণ কোরে গান কোরতে হয়। এরই নাম কীর্তন। স্মরণ মানে—স্মরণ কোরতে হয়। পাদসেবন—ভগবানকে আত্মবৎ সেবা কোরতে হয়। ভগবানের প্রতি প্রীতি-প্রেম সহ তাঁর সেবা করার নামই পাদসেবন। অর্চনা মানে—পুজো। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ধুনা, দীপ, নৈবেদ্যাদির দ্বারা ভগবানের পুজো। বন্দনা মানে—প্রণাম। ভক্তিসহকারে তাঁকে প্রণামাদি করা। দাস্য—দাসভাবে ভগবানের সেবা। তাঁর সেবক আমি, তাঁর দাস আমি এইভাব। সখ্য—সখা বা বন্ধু ভাব। অতি আপনার জন। ভয়, লজ্জা, ঘৃণা কিছুই থাকবে না। বন্ধুর কাছে কি কিছু গোপন থাকে? তাঁর কাছে সব বলা যায়; সেইরূপ ব্যবহার করা যায়। আত্ম-নিবেদন মানে—ভগবানের চরণে নিজকে নিবেদন করা। নিজের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য সব নিবেদন করা। নিজের বোলতে কিছুই থাকবে না। শরীর, মন, আত্মা, সব তাঁর—এইরূপ ভাব। সব চাইতে বড় জিনিষ হ'ল, ভগবানের উপর নিজেকে ফেলে দেওয়া। তাঁর চরণে নিজেকে নিবেদন করা।"

২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩৬

রাত্রি প্রায় আটটা। স্বামিজীর কাছে কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। পুনরায় যাইতেই স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে? তুই রুটিন কোরে কাজ কচ্ছিস তো? যেমন যেমন

ব'লেছি? ভোরে ঘুম থেকে পাঁচটায় অন্ততঃ উঠবি, আরও আগে হ'লে ভাল হয়। আমি কয় ঘণ্টা ঘুমুই? তারপর হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে অথবা স্নান কোরে ভজন, জপ ধ্যান সেরে নিবি। গায়ত্রী জপ কোরে প্রার্থনাদি কোরবি। অন্ততঃ দশ হাজার জপ কোরতে হ'বে। কিছু কিছু গীতা বা কথামৃত রোজ পড়বি। যখন যা খাবে, মনে মনে ভগবানকে নিবেদন কোরে খাবে। জলটুকু পর্যন্ত নিবেদন কোরে খাবে। কারো নিন্দা স্তুতি একদম কোরবিনে; ওতে সঙ্ঘের সর্বনাশ হ'য়ে যায়। দেখছিস তো র—কারো নিন্দা-স্তুতিতে থাকে না। ভাল সাধু হ'তে হ'লে এখন থেকে সব অভ্যাস কর। সকলেরই এসব নিয়ম কোরে চলা উচিত।"

২৫শে পৌষ শুক্রবার ১৩৪২ সাল, ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"ভগবানকে শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা ডাকাই শ্রেষ্ঠ। তাঁকে ভক্তি, প্রেম দিয়ে ডাকলেই হ'ল। যোগের বিষয় জেনে কি হ'বে? শ্রদ্ধা, ভক্তি, রুচি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, রতি, স্থায়ীভাব, এসব হ'ল প্রেমভাবে ভগবানকে ডাকার সহায়ক। ভক্তেরা আবার মুক্তিও চারি প্রকার স্বীকার করে—সালোক্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য আর সাযুজ্য।"

—"অষ্টাঙ্গ যোগ হ'ল—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই সব। সমাধি আমরা তো দুই রকম জানি। এক হ'ল সবিকল্প আর হ'ল নির্বিকল্প। রাজযোগে অনেক প্রকার সমাধির কথা আছে—যেমন সবিতর্ক, নির্বিচার, সানন্দ, নির্বিতর্ক, সস্মিতা, সবিচার, অসম্প্রজ্ঞাত, আবার মধুপ্রতিক, মধুমতি, বিশোকা, সংস্কারশেষ। আবার বেদান্তের মতেও আট প্রকার সমাধির কথা আছে। তোর অত সমাধির দরকার কি? একটাই হ'ল না অত শুনে কি হ'বে? দু'একটা

আগে লাভ কর, তবে তো অন্যগুলি বুঝবি ? নতুবা আমি বল্লেও তুই বুঝতে পারবি নে।"

১লা মাঘ বুধবার ১৩৪২ সাল, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৬

কয়েকটী গৃহস্থকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিতেছেন—"সৎসঙ্গ একান্ত দরকার। এতে মনের সৎবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে জেগে যায়। সৎ প্রবৃত্তি হয়। সদ-সৎ বিবেক হয়। সৎ বাসনা, ভগবানকে পাওয়ার বাসনা হ'লে, তবে তো তাঁকে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা আসবে ? সাধুসঙ্গে মনের মলিনতা কেটে যায়। তখন সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে ভজনাদি কোরবার প্রবৃত্তি তোমার হ'বে। আর তুমি অসৎ সঙ্গে থাক, তোমার অসৎ ভাবগুলি ফুটে উঠবে। কথা হ'ল তুমি মনের যেমন খোরাক দে'বে তেমনই তোমার ভাবধারা হ'বে। এই ধর তুমি সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ, সৎ আলোচনা কর, তোমার সৎবৃত্তির খোরাক দেওয়া হ'বে। আর অসৎসঙ্গ, অসৎ আলোচনা কর, দেখবে তোমার অসৎ প্রবৃত্তি বেড়ে গেছে। অসতের খোরাক না দাও সে মরে যাবে, তার কোন কার্যকরী শক্তি থাকবে না।"

২রা মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"তোর চরিত্র দেখেই আমি বুঝতে পারি তুই কি কচ্ছিস্ না কচ্ছিস্। ভজনাদি দ্বারা যদি তোর চরিত্র পরিবর্তিত না হয়, তো বুঝবো তোর ঠিক ঠিক ভজনাদি হচ্ছে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, নিন্দাস্তুতি এসব যদি না গিয়ে থাকে, বুঝবো তোর কিছু হয়নি। ঠাকুরের কথায় আছে—"কাশীর দিকে যত এগুবে কলিকাতা তত দূরেই পড়বে।" যতই কাশীর দিকে এগুবে, ততই কলিকাতা পেছনে থাকবে। তেমনি যতই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ কোরবে ততই তোমার জাগতিক ভোগবাসনা ত্যাগ হ'বে। এই হ'ল সাধনার মাপকাঠি।"

৮ই মাঘ বুধবার ১৩৪২ সাল, ২২শে জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"আমি অনেক দেশ বিদেশ ঘুরে দেখেছি। কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশ কোন অংশে খারাপ নয়। বরং সব জাতি আমাদের দেশ থেকে নানা ভাবধারা, বহু ঐশ্বর্য নিয়ে গেছে। আমরা পরাধীন ব'লে কিছু কোরে উঠতে পারিনে। এদেশ স্বাধীন হোক, দেখবি আবার সব কিছু গড়ে উঠবে। শিল্প, বানিজ্য, শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু এখানে আবার হ'বে। বেটারা বলে কিনা আমাদের দেশে কল-কব্জা তৈরী হ'তে পারে না। কেন? ওদের দেশের চাইতে আমাদের দেশের আবহাওয়া খারাপ নাকি? অত ঠাণ্ডা দেশে Temper কোরে মেসিনের parts তৈরী হ'তে পারে তবে আমাদের দেশে ঐরূপ আবহাওয়া তৈরী কোরে কাজ চলতে পারে না কেন? না হয় যদি ব'ল ঠাণ্ডা দেশ চাই, তো হিমালয়ের দিকে Factory হ'তে পারে। আমাদের দেশে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই আছে।"

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩৬

রাত্রি দশটা। উ—বাবুর সহিত বিভিন্ন আলোচনা হইতেছে। স্বামিজী বলিলেন—"কিযে তোমরা ব'ল আমি বুঝতেই পারিনে। তোমরা ঠাকুরের ভক্ত, তোমাদের উপর তাঁর কৃপা হ'বে না? আমি সব ছেলেদের তো আশীর্বাদ কচ্ছিই। আমার কাছে তোমরা কত স্নেহ ভালবাসা পাচ্ছ এও তো ঠাকুরের কৃপা। এ'র পর তো তোমরা আর কাউকে পাবে না। এখনও তো আমরা আছি। একে একে সব তো চলে গেলেন, এখন তাঁর শেষ প্রদীপ আমরাই ধরে আছি। কি বল?" (হাস্য)

১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪২ সাল, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৬

স্বামিজী—"তোদের স্কুলে পড়া বিদ্যের কোনও মূল্য নেই। ইংরেজরা এদেশে এসে এই বুঝুতে চাইছে যে তোদের দেশে কিছুই ছিল না। ছেলেদেরও

তেমনিই শিক্ষা দিচ্ছে! কিন্তু তারা এদেশের কোন ইতিহাস ভাল কোরে পড়বে না। ধর্মপুস্তক তো একদম পড়ে না বল্লেই হয়।"

—"আচ্ছা বলত, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে কি জানিস? ব্রজের গোপিকা নিয়ে যে খেলা হ'য়েছিল তা কি সত্যি? না না, এর কোনটাই সত্যি নয়, মিথ্যে; এর কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। তোরা পাশকরা মূর্খ, ধর্মজগতে তোরা ছেলেমানুষ। রামায়ণ, মহাভারত পর্যন্ত পড়িস নে! আমি ছেলেবেলায় মায়ের নিকট ব'সে ব'সে এই সব শুনে শিখে নিয়েছিলুম। আমায় আর নতুন কোরে পড়তে হয়নি। ছেলেবেলায় যদি ধর্মজগতে প্রবেশ কোরতে না পারিস, তবে কি ঠিক ঠিক ধারণা কোরতে পারবি? ছেলেবেলা থেকে সৎ অভ্যাস কোরতে হয়। নতুবা পাকা মাটিতে গড়ন চলে না।"

২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩ সাল, ১১ই অক্টোবর ১৯৩৬

স্বামিজী—"দেখ, ইংরেজরা ভারতীয়দের মানুষের মধ্যেই ধরতে চায় না নতুবা দেখছিস নে, এদের উপর কত অত্যাচার করে? তারা ব'লে কালা আদ্‌মি আবার মানুষ? ওদের দেশে আগে গেলে ঘৃণা কোরত, একসঙ্গে বোস্‌ত না, এমনকি হোটেলে পর্যন্ত না। এখন কিছুটা সে ভাব উঠে গেছে। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) গিয়ে যেন সে ভাবটা মুছে দিয়ে এসেছেন। সব স্বামিজীর অনুগত হ'য়ে গেছ্‌ল। তাই এখন যে সে গিয়ে স্থান পায়। দেখছিস্ নে? যো—গিয়ে ব্যবসা খুলেছে! টাকা নিয়ে যোগ শেখাচ্ছে।"

—"গোঁড়ামি এখন আর চল্‌বে না। আগেকার মত কি এখন বৈষ্ণব আছে? এখন একে অন্যকে হিংসে করে। ধর্মের নামে একটা অধর্মের সৃষ্টি ক'চ্ছে। তাঁরা আবার ৺কালীকে বলে খালী। (হাস্য) পাছে কালীর নাম করা হ'য়ে যায়, এই ভয়। মনে করে কালী কিছুই নয়। এসব

সমস্যার সমন্বয় কোরতেই ঠাকুরের দরকার হ'য়ে ছিল। যতদিন না, সব ধর্মের এক জ্ঞান হ'বে, ততদিন কিছুই হয়নি বুঝতে হ'বে। ধর্ম আর গোঁড়ামি একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না।"

৩রা কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ২০শে অক্টোবর ১৯৩৬

একটি ভক্ত প্রাতে নয় ঘটিকায় তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দীক্ষার জন্য স্বামিজীকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া অফিস ঘরেই স্বামিজী দীক্ষা দিলেন এবং তাঁহাদের বলিতেছেন—"এখন তো মহামন্ত্র পেয়ে গেলে; তাঁর উপর তোমাদেব ভার দিয়ে দিলুম। খুব নিষ্ঠার সহিত জপ-ধ্যান কোরতে থাক। ত্রিসন্ধ্যা না পার দুবার অন্ততঃ নাম কোরবে। সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি ধ্যান কোরবে। ধ্যান-রহিত জপে কোন ফল হয় না। জপের সঙ্গে ধ্যান কোরবেই। আর তাঁর উদ্দেশ্যে একটু ফুল চন্দন দেওয়া ভাল। সব কিছু নিবেদন, ইষ্টমন্ত্রেই কোরবে। জল, নৈবেদ্য, যাই হোক্ না কেন। নিত্য ভজনাদির পর এই সব কোরবে। পারতো নির্দিষ্ট ঘরে পুজো জপ কোরবে। যাও, এখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে একটু জপ-টপ কর। আমিতো আশীর্বাদ করলুমই।"

৪ঠা কার্তিক বুধবার ১৩৪৩ সাল, ২১শে অক্টোবর ১৯৩৬

আজ কয়েকটী গৃহস্থ ভক্তের সহিত কথা হইতেছে। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিতেছেন—"সংসার তো কর্মক্ষেত্র। এখানে কর্ম কোরতেই আসা। তুমি ভালই কর আর মন্দই কর, তার ফল ভোগ কোরতেই হ'বে। তুমি বনে যাও সেখানেও মনের দ্বারা কর্ম কোরবে। যতদিন পর্যন্ত কর্মের বাসনা ক্ষয় না হয় ততদিন নিস্তার নেই। বাসনা থাকতে কি কর্মত্যাগ হয়? প্রবৃত্তি-মার্গে থাক্‌বে তো কি ক'রে নিবৃত্তি হ'বে? দিন দিন

বিচার কোরতে হয়। তবে ভোগবাসনা কম্‌তে থাকে। ভোগেতে কি আছে? বিচার কর, দেখ্‌বে ওতে যথার্থ শান্তি নেই। ভোগের দ্বারা কি আনন্দ পাওয়া যায়? ওতে ক্ষণিক হয়ত একটু আনন্দ পেলে, কিন্তু পরক্ষণেই অবসাদ।"

—"ভজনাদি কর, দেখবে তখন ভজনাদিই তোমার কর্ম হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন দিন দিনই শান্তির অধিকারী হ'তে থাক্‌বে।—সৎ কর্ম? তাতো ভালই: ওতেও তো মন শুদ্ধ হ'য়ে যাবে। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম খুব ভাল, যদি ঠিক ঠিক কোরতে পার।"

৫ই কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ২২শে অক্টোবর ১৯৩৬

স্বামিজী—"দেখ, ওদের কি সংকীর্ণ ভাব। আমাদের বাদ দিয়েই সব চালাতে চায়, একি হয়? ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিয়ে এসেছেন, এঁদের কাউকে বাদ দিলে চলে কি? তা হ'লে তিনি অসন্তুষ্ট হ'বেন। স্বামিজী মহারাজ, প্রেমানন্দ মহারাজ, রাজা মহারাজ এঁরা আমায় কত ভালবাসতেন। এখনো তাঁদের ভালবাসা বুঝতে পারি। ঠাকুরের তো কথাই নেই। যারা তাঁর উদার ভাব না নিয়ে সংকীর্ণ ভাব নেবে, তারা মহৎ নয় জান্‌বি। তাঁর উদার ভাব ছিল, হিংসা প্রবৃত্তি তাঁর আদৌ ছিল না; এসব পছন্দও কোরতেন না। ঠাকুর তো বোলতেনই যে—"এখানকার উদার ভাব।"

৬ই কার্তিক শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৬

স্বামিজী—"তাঁর ইচ্ছে, তিনি জগৎ সৃষ্টি কোরবেন। তুমি আমি তাঁর ভাবের কি বুঝবো? তুই কি বোলতে পারিস্‌, তাঁর কাজ ভাল কি মন্দ? সকলকে মুক্তি দেওয়া না দেওয়াও তাঁর ইচ্ছে। আচ্ছা, তিনি যদি

সকলকে একদিন মুক্তই ক'রে দেন তো তাদের কর্মফল, তাদের অসৎ সংস্কার কে নেবে? তুই ভুগবি? কর্মফল ভোগ শেষ না হ'লে, কারো মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি তো সকলকে সৎ কোরতেই চাইছেন। সৎ অসৎ তিনি দুই দিয়েছেন। সৎ না থাক্‌লে অসতের কোন মূল্য থাকে না। তেমনি অসৎ না থাকলেও সৎএর কোন মূল্য থাকে না। সৎ অসৎ নিয়েই সৃষ্টি। তাঁর উদ্দেশ্য কি, তা আমি কি জানবো, তুই তাঁকে জিজ্ঞেস কল্লেই পারিস?" (হাস্য)

১২ই কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ২৯শে অক্টোবর ১৯৩৬

স্বামিজী বৈকাল বেলা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কিরে আজ তো লক্ষ্মীপুজো, মনে আছে তো? গত বৎসরের ঘট আছে? সেই ঘটটীতে পুজো কোরে, ওটী বিসর্জন দিস্, আর এবারকার ঘটটী রেখে দিস। আমরা যে ঐশ্বর্য চাই, তা নিজের জন্যে নয়; সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যে।"

১৭ই কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ৩রা নভেম্বর ১৯৩৬

রাত্রি নয় দশটা হইবে। ব্রহ্মচারী নিখিলচৈতন্য মহারাজ সঙ্গে আছেন। সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে স্বামিজী বলিতেছেন—"তোদের তো অনেকবার ব'লেছি তমোগুণ ত্যাগ কোরতে হ'বে। ঘুম তমোগুণের কায। ঠাকুর বার বৎসর ঘুমোন নি। আমি চিৎপাত হ'য়ে ধ্যান করতুম। যখন ঘুম পেত, উঠে পড়তুম। ঘুম তাড়িয়ে দিয়ে আবার ধ্যান কোরতুম। এখনো তো দেখছিস্? আমি কতক্ষণ ঘুমোই? ঘুম তমোগুণের চিহ্ন, প্রশ্রয় দিবি কেন? জেগে থাক্‌বি। ঘুম পেলে তাড়িয়ে দিবি। কম ঘুমুলে শরীরের ক্ষতি হয় না, সংযম আছে কিনা?

রজোগুণে ঘুম পায় না, খুব কর্মের প্রবৃত্তি হয়, সৎকর্ম কোরতে ইচ্ছে হয়। সত্ত্বগুণে মানুষকে তো শান্ত ক'রে দেয়, মানুষ নির্বিকার হ'য়ে যায়। হাতে নাতে কোন কাজ কোরবার শক্তি থাকে না।"

১৮ই কার্তিক বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৬

সকালবেলা মন্দিরের কথা উঠিল। মন্দিরে বেদী হইবে স্বামিজী নীচে আসিয়া সকলকে লইয়া মন্দিরে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন —বেদী কেমন হইবে। স্বামিজী বলিলেন—"দুই দিকে দুই জন ভক্ত ঠাকুরের ছবি ধরে আছেন, এইরূপ বড় বেদী হ'লে ভাল হয়। আমরাই তো ভক্ত; তবে কি আমরাই ধরে থাকবো? (হাস্য)। তা হ'লে এখন আমি ধরে থাকি, পরে তোরা ধরে থাকিস্। এইরূপে পুরুষ-পরম্পরা চলবে; বাপের সম্পত্তি কিনা? (হাস্য)। পুনরায় স্বামিজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"হ্যাঁ, আমরাই তো তাঁকে ধরে আছি। তাঁর ভাবধারা যে ধরে আছে, সেই তাঁকে ধরে আছে। তিনি আমাদের ধরে আছেন, তাই আমাদের প'ড়বার ভয় নেই। আর আমরাও তাঁকে ধরে আছি। তাই আমরাও নিশ্চিন্ত।"

স্বামিজী নিজেই মন্দিরের মাপ লইলেন এবং ছবির মাপ করিতে আদেশ দিলেন। তারপর পুরাতন মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের ছবি দেখিয়া উপরে গেলেন।

১৯শে কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ৫ই নভেম্বর ১৯৩৬

প্রশ্ন—ঠাকুরকে লাভ কোরে কি লাভ?

স্বামিজী—"লাভ ক'র তখন বুঝবি? তখন সমস্ত দুঃখের শেষ হ'বে, আর কি? মানুষ তো সুখ চায়? এ হ'ল সত্যিকারের সুখ-দুঃখের পারে গেলি।

আর জন্ম-মৃত্যু থাক্‌বে না। তাঁকে পেলে আর এ সংসারের দুঃখে পড়তে হয় না। আগে তাঁকে লাভ কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। এখন তোর ওসব ভাববার দরকার নেই। ঠাকুর বোলতেন—"ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।" জন্মে যদি ভগবানের চিন্তা, সাধন ভজন নাই কোরলি, তবে তো জন্মে লাভ না হ'য়ে লোকসানই হ'ল, [১] আরও বরং কতকগুলি বদ সংস্কার নিয়ে গেলি।"

২০শে কার্তিক শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ৬ই নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"মানুষ জন্ম হ'ল শ্রেষ্ঠ জন্ম। তোর যদি কর্ম ভাল হয়, তো পরে দেবতাও হ'তে পারিস্। উচ্চ স্তরের দেবতাদের ভোগ-বাসনা নেই। তাঁরা কোন বন্ধনে থাকেন না। তুই কি চাস্? যা চাইবি তাই হবি। তোর কর্ম সৎ হ'লে, তোর সংকল্প শুদ্ধ হ'লে, তুইই দেবতা হ'বি। আর যারা আন্তরিক ভাবে মুক্ত হ'তে চায়, তারাই মুক্ত হ'বে। তাঁর কাছে যা চাইবি তাই পাবি। যা চাইবি, প্রাণের সহিত চাইবি। তিনি কল্পতরু। ঠাকুরের কেমন ব্যাকুলতা হ'য়েছিল?—"মা দেখা দে, মা দেখা দে, নইলে গলায় খাঁড়া দিয়ে মরব।" এরূপ তোর কখনো হয়? হ'লে দেখা পাবি। মনের যেরূপ ভাব সেরূপই পাবি। খেতে চাস্ খেতে পাবি, টাকা চাস্ টাকা পাবি, সুন্দরী মেয়ে চাস্ তাই পাবি। (হাস্য)। কিছুই চাইবি নে, তো বেশ, তাঁকে আত্ম সমর্পণ কর। তিনি যা কোরবেন তাই হ'বে। ঠিক ঠিক চাইলে তাঁর পায়ে তোকে স্থান দেবেন। তিনি সুখেই রাখুন আর দুঃখেই রাখুন, স্বর্গে বা নরকে, যেখানেই রাখুন না কেন, তাতেই আনন্দে থাক্‌বি।"

---

১ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। কেন উপনিষদ।

রজোগুণে ঘুম পায় না, খুব কর্মের প্রবৃত্তি হয়, সৎকর্ম কোরতে ইচ্ছে হয়। সত্ত্বগুণে মানুষকে তো শান্ত ক'রে দেয়, মানুষ নির্বিকার হ'য়ে যায়। হাতে নাতে কোন কাজ কোরবার শক্তি থাকে না।”

১৮ই কার্তিক বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৬

সকালবেলা মন্দিরের কথা উঠিল। মন্দিরে বেদী হইবে স্বামিজী নীচে আসিয়া সকলকে লইয়া মন্দিরে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন —বেদী কেমন হইবে। স্বামিজী বলিলেন—“দুই দিকে দুই জন ভক্ত ঠাকুরের ছবি ধরে আছেন, এইরূপ বড় বেদী হ'লে ভাল হয়। আমরাই তো ভক্ত; তবে কি আমরাই ধরে থাকবো? (হাস্য)। তা হ'লে এখন আমি ধরে থাকি, পরে তোরা ধরে থাকিস্। এইরূপে পুরুষ-পরম্পরা চলবে; বাপের সম্পত্তি কিনা? (হাস্য)। পুনরায় স্বামিজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—“হ্যাঁ, আমরাই তো তাঁকে ধরে আছি। তাঁর ভাবধারা যে ধরে আছে, সেই তাঁকে ধরে আছে। তিনি আমাদের ধরে আছেন, তাই আমাদের পড়বার ভয় নেই। আর আমরাও তাঁকে ধরে আছি। তাই আমরাও নিশ্চিন্ত।”

স্বামিজী নিজেই মন্দিরের মাপ লইলেন এবং ছবির মাপ করিতে আদেশ দিলেন। তারপর পুরাতন মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের ছবি দেখিয়া উপরে গেলেন।

১৯শে কার্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ৫ই নভেম্বর ১৯৩৬

প্রশ্ন—ঠাকুরকে লাভ কোরে কি লাভ?

স্বামিজী—“লাভ ক'র তখন বুঝবি? তখন সমস্ত দুঃখের শেষ হ'বে, আর কি? মানুষ তো সুখ চায়? এ হ'ল সত্যিকারের সুখ-দুঃখের পারে গেলি।

আর জন্ম-মৃত্যু থাক্‌বে না। তাঁকে পেলে আর এ সংসারের দুঃখে পড়তে হয় না। আগে তাঁকে লাভ কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। এখন তোর ওসব ভাববার দরকার নেই। ঠাকুর বোলতেন—"ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।" জন্মে যদি ভগবানের চিন্তা, সাধন ভজন নাই কোরলি, তবে তো জন্মে লাভ না হ'য়ে লোকসানই হ'ল, [১] আরও বরং কতকগুলি বদ সংস্কার নিয়ে গেলি।"

২০শে কার্তিক শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ৬ই নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"মানুষ জন্ম হ'ল শ্রেষ্ঠ জন্ম। তোর যদি কর্ম ভাল হয়, তো পরে দেবতাও হ'তে পারিস্। উচ্চ স্তরের দেবতাদের ভোগ-বাসনা নেই। তাঁরা কোন বন্ধনে থাকেন না। তুই কি চাস্? যা চাইবি তাই হবি। তোর কর্ম সৎ হ'লে, তোর সংকল্প শুদ্ধ হ'লে, তুইই দেবতা হ'বি। আর যারা আন্তরিক ভাবে মুক্ত হ'তে চায়, তারাই মুক্ত হ'বে। তাঁর কাছে যা চাইবি তাই পাবি। যা চাইবি, প্রাণের সহিত চাইবি। তিনি কল্পতরু। ঠাকুরের কেমন ব্যাকুলতা হ'য়েছিল?—"মা দেখা দে, মা দেখা দে, নইলে গলায় খাঁড়া দিয়ে মরব।" এরূপ তোর কখনো হয়? হ'লে দেখা পাবি। মনের যেরূপ ভাব সেরূপই পাবি। খেতে চাস্ খেতে পাবি, টাকা চাস্ টাকা পাবি, সুন্দরী মেয়ে চাস্ তাই পাবি। (হাস্য)। কিছুই চাইবি নে, তো বেশ, তাঁকে আত্ম সমর্পণ কর। তিনি যা কোরবেন তাই হ'বে। ঠিক ঠিক চাইলে তাঁর পায়ে তোকে স্থান দেবেন। তিনি সুখেই রাখুন আর দুঃখেই রাখুন, স্বর্গে বা নরকে, যেখানেই রাখুন না কেন, তাতেই আনন্দে থাক্‌বি।"

---

১ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। কেন উপনিষদ।

—"গুরু চাই বৈ কি? সব কাজেই গুরুর দরকার। এক জনকেই ধ'রে থাক্তে হয়। আমি সতের বৎসর বয়েস থেকে ঠাকুরকেই ধরে আছি। ঠাকুরই হ'লেন ভগবান। অন্য কেউ এসে যদি বলে আমি ভগবান তা আমি মানবো না। আমি রামকৃষ্ণ ছাড়া কারো পায়ে মাথা নোয়াই নি। তাঁর শক্তিতে বীরের মত চলে যাচ্ছি। তিনিই শক্তি, তিনিই শান্তি, তিনিই একমাত্র আশ্রয়। এভিন্ন আর কিছুই জানিনে।"

২১শে কার্তিক শনিবার ১৩৪৩ সাল, ৭ই নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"সত্যিই তো আমি কি দীক্ষা দিচ্ছি? আমি কি শরীর না মন? আমার শরীর মন আশ্রয় কোরে ঠাকুরই দীক্ষা দিচ্ছেন। আমি কি গুরু নাকি? গুরু তো তিনি, যিনি দীক্ষা দেন। তবে দেখ, দীক্ষা তো দিচ্ছেন ঠাকুর; গুরুও তিনি; শক্তির দিক দিয়েও দেখ, শক্তি এক। তা হ'লে গুরুশক্তি এক ভিন্ন দুই নয়। এ শরীর মন সবই তাঁর। অনেক দিন আগেই তাঁকে দেওয়া হ'য়ে গেছে। তোদের তো সুবিধেই হ'ল। গুরু ইষ্ট সব তিনি। এভাবেই ধ্যান কোরবি। গুরুকে চিন্তা দ্বারা ইষ্টতে লয় কোরে দিবি. এরকম ভাবে সব কোরবি।—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হ'য়ে যান।[১] ঠাকুরকে আমরা ভগবান ব'লে জেনেছি। তা হ'লে দেখ, আমরাও তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হ'য়েছি।"

২৪শে কার্তিক মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"কিরে, তুই নাকি আমার কাছে কিসের পয়সা পাবি? তা বেশ (হাস্য মুখে) আমার কাছেও টাকা নিবি? নে বাবা!

---

১ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—উপনিষদ।

ভক্তসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিশ্রের সৌজন্যে
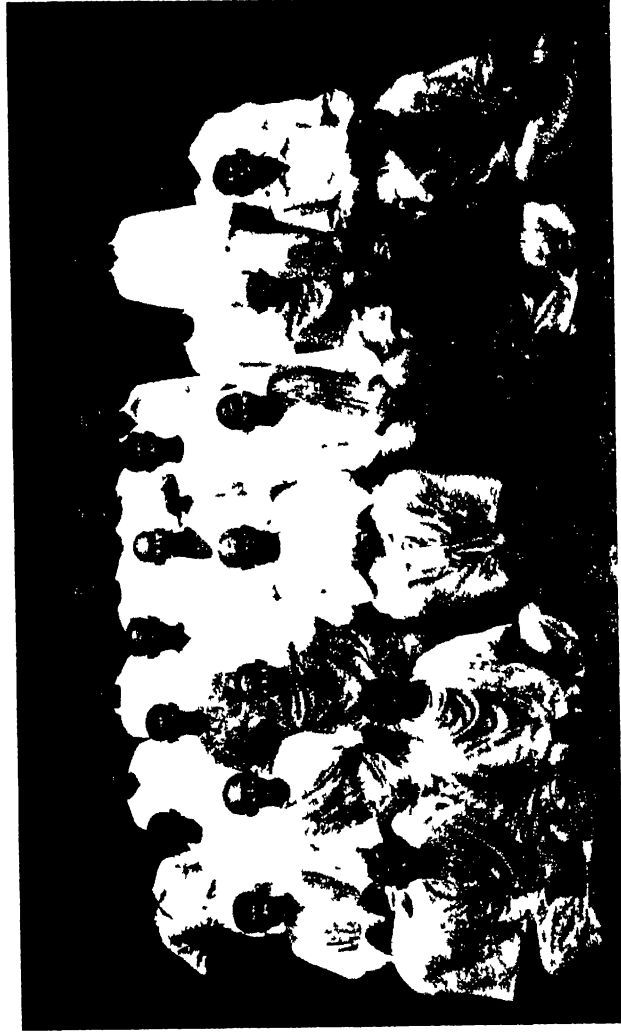
শেষে কি তোর পয়সা শোধ কোরতে আমি আবার আসবো? তা হ'বে না।" (হাস্য)

দীক্ষা লইবার জন্য কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাই দীক্ষার কথাবার্তা হইতেছে। স্বামিজী—"শাস্ত্রে দীক্ষা তো অনেক প্রকারই দেখা যায়। তবে আমরা সাধারণতঃ তিন প্রকারই দীক্ষা দিই। শাক্তী, শাম্ভবী ও মান্ত্রী। শাক্তী মানে—গুরু নিজ শক্তি দিয়ে শিষ্যের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত কোরে দেন। শিষ্যের খাটুতে হয় না। শাম্ভবী মানে—দৃষ্টিমাত্রে শিষ্যের শক্তি জেগে উঠে, শিষ্য তার স্বরূপ বুঝতে পারে। এতেও শিষ্যের সব সংস্কার গুরু নিজে নিয়ে নেন। আর মান্ত্রী দীক্ষা মানে—শিষ্যের কাণে মন্ত্র দেওয়া, তখন শিষ্য ধ্যান-ধারণা, পূজো পাঠ দ্বারা নিজের মুক্তি লাভ করে। শিষ্য ইষ্ট দর্শন করে। আবার আছে—ক্রিয়াবতী, বর্ণময়ী, কলাবতী, বেদময়ী দীক্ষা। তন্ত্র পড়লে এসব দেখতে পাবে। তাতে অর্ঘ্যাদিও আছে।"

২৫শে কার্তিক বুধবার ১৩৪৩ সাল, ১১ই নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"মন চঞ্চল হ'য়েছে, তা কি কোরবে? এখান থেকে চলে গেলে কি স্থির হ'বে? তা হ'বে না। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকৃতে গেলে তো অসুবিধা হ'বেই। তোমার অসুবিধের কথা ঠাকুরকে জানাও। তিনি ইচ্ছে কোরলেই মোড় ফিরিয়ে দেবেন। তুই তাদের সঙ্গে মিশিস কেন? তোর ভাবে তুই থাক্‌বি।"

২৭শে কার্তিক শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৬

সন্ধ্যার পর স্বামিজী অফিস্ ঘরে আসিয়াছেন। আজ ৺কালীপূজা হইবে। যাঁহারা অভিষেক লইয়াছেন তাঁহারাই পূজা করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে স্বামিজী কথাবার্তা বলিতেছেন। রাত্রে তিনি পূজার ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ

থাকিবার পর চলিয়া আসিলেন। তখন বলিতেছেন—"শক্তি পুজো না কোরলে কি শক্তি জাগে? আদ্যাশক্তি মহামায়া। শক্তি মানে সুধু কালীই নয়? সমস্ত স্ত্রী মুর্তিই শক্তি মূর্তি।[১] বীরের পুজো কোরবি, তা হ'লে বীব হ'বি। তমোগুণীর পুজো ছেড়ে রজোগুণের পুজো কোরতে হ'বে, তবেতো?"

পরদিন প্রাতে স্বামিজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি শয়নঘবে বসিয়া আছেন। আমি যাইতেই বলিলেন—"কিরে, রাত্রে পূজাদি কেমন হ'ল? নে প্রসাদ নে।" বলিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া তদোপরি চামচের সাহায্যে প্রসাদ দিলেন।

২৯শে কার্তিক রবিবার ১৩৪৩ সাল, ১৫ই নভেম্বর ১৩৩৬

স্বামিজী—"জপ-মালা অনেক রকমই আছে। সাধারণতঃ আমরা রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, তুলসী, শঙ্খের মালাই জপ কোরতে দি। করমালা, বর্ণমালা, মনি-মালাতেও জপ হয়। স্বীয় করে জপ করার নামই কর জপ। অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা যে জপ করে তা হ'ল বর্ণমালায় জপ। মালাতে জপই হ'ল মনিমালা। এই ধর রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, কাঁচ, পদ্মবীজ, শঙ্খ, মণি, রত্ন, সোনা, সিল্কেরগুটি, রূপা, চন্দন, আরও কত রকমের মালা আছে। শাক্তরা রুদ্রাক্ষ মালায় জপ কোরবে। বৈষ্ণবরা তুলসী মালায়, মুসলমানেরা কাঁচ বা রিঠের বীজের মালায় জপ করে। শাক্তদের বিভিন্ন বকমের মালা আছে। তা নিষ্ঠাব সহিত যে মালাই জপ কোবনা কেন, তাতেই ফল হ'বে। মুল হ'ল জপ করা। সংখ্যা রাখা প্রথম প্রথম ভাল। তাতে নিজকে যাচাই কোববার সুবিধে হয়। সর্বদা জপ কোরবি, তোর দরকার কি সংখ্যার? মনে মনে সর্বদা জপ করা যায়। এতে সংখ্যার দরকার নেই।"

---

১ বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। চণ্ডী।

—"জপ সাধারণতঃ এই তিন প্রকার; তারপর আরও কত প্রকার জপ আছে, অজপা-জপ, নিত্য-জপ, মানস-জপ, সঙ্কল্প-জপ—এই সব। ইষ্ট মন্ত্র জপ কোরলেই মালা শোধন হ'য়ে গেল, ইষ্ট মন্ত্র জপ ক'রে মানুষ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, আর মালা হ'বে না ?"

৩০শে কার্তিক সোমবার ১৩৪৩ সাল, ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"অষ্ট পাশ হ'ল আটটী বন্ধন। যথা :—উদায়ুধ, কম্বু, কোটিবীর্য, ধৌম্র, কালক, দৌহৃদ্য, কালকেয়, মৌর্য। তার মানে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কুল, শীল, জাতি, কাল বা জুগুপ্সা, আর অহঙ্কার। এসব এক একটী বন্ধন। এর হাত এড়ান কি কম কথা? ঠাকুর যেমন বোলতেন—"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" এই অষ্ট পাশ ত্যাগ কোরতে পারলে, তো সাধন জগতে পা দিলে। এইসব প্রথম চাই। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) মান, অপমান এত সয়েছিলেন ব'লেই তো এত বড় হ'য়েছেন। আমরাই কি কম সয়েছি? এখনো তো কত লোকে আমাদের নিন্দে করে। তাঁর জন্যে আমরা সব ত্যাগ কোরেছি। যারা এসব সইতে পারবে, তারাই তাঁর কাজ কোরবার অধিকারী হ'বে। ল—কে ধরে নিয়ে গেল, থানায় রেখে দিলে। তার অপরাধ, সে ষ্টেসনে পয়সা ভিক্ষা কোরছিল। তারপর এরা গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। সে কি সমিতির জন্যে কম কোরেছে। তোরা কি কোরেছিস্? সে সব সাধুদের ভিক্ষে ক'রে খাওয়াত। সে না এলে এদিকে বান্নাই হ'ত না। তোরা তো এখন ব'সে খাচ্ছিস।"

৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ২০শে নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"অবতার তো যখনই দরকার হয় তখনই আসতে পারে। তার আবার দশজনই কি, আর বিশজনই কি। দরকার হ'লেই তিনি আসবেন।

তাতো ভগবানই ব'লে গেছেন। যখনি প্রয়োজন হ'বে তখনই তিনি আসবেন।[১] দশ অবতার; তা চৈতন্য কি অবতার নয়? তিনিও অবতার। ভাগবতে আছে চব্বিশ অবতার। তা যাঁরা ধর্মের জন্যে আত্মত্যাগ ক'রে মানবজাতির পথ দেখিয়ে দেন, তাঁরাই অবতার। যীশুও অবতার; মহম্মদও অবতার। পাঞ্জাবে গুরু নানককে অবতার ব'লে। তোরা তো শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে চেষ্টা কোরবি নে? ভাষা ভাষা অর্থ কোরে নিজের মত ব্যাখ্যা কোরবি। নচেৎ নিজেদের গোঁড়ামি থাকে না, দল থাকে না।"

১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ২৮শে নভেম্বর ১৯৩৬

রাত্রি এগারটার সময় কয়েকজন ভক্ত উঠিয়া গেলেন, স্বামিজী বলিলেন— "কিরে মন-টন ভাল আছে তো? থিয়েটার, বায়স্কোপের পল্লীতে আশ্রম হ'ল, এরই মধ্যে থেকে আদর্শ হ'তে হ'বে। ওসব দিকে যাস্‌নি। সেদিন শিবরাত্রি কেমন হ'য়েছিল? "রূপবানী"র মেয়েরা তোদের মাঝে মাঝে দেখছিল। চৌপররাত তোরা 'হর হর বম্ বম্' বোলছিলি আর তারা ছবি দেখে রাত জাগছিল। যদি ভগবানের নামই না হ'ল তো রাত্রি জেগে কি হবে? তাই এদের বোলছিলুম, এরা কেমন সব এখানে রয়েছে দেখ! এরা সাক্ষাৎ শিব সেজে ব্যোম, ব্যোম, বোলছিল, আর তারা তা দেখছিল। এরা কত ভাল বল দেখিনি? সবাই মিলে ভগবানের নাম কোরবি, আনন্দ কোরবি—এটাই শ্রেষ্ঠ লাভ?"[২]

---

১ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা ৪।

২ যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। গীতা, ৬।২২

১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩৪৩ সাল, ২৯শে নভেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"মূলতত্ত্ব তিনটি—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব। এই তিনটী থেকেই সব সৃষ্টির যত তত্ত্ব উৎপত্তি হ'য়েছে। এই তত্ত্বের মানে হ'ল—সৎ-চিৎ-আনন্দ। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম। আত্মতত্ত্ব থেকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হ'য়েছে। পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, রূপ, রস, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি এই সব। বিদ্যাতত্ত্ব থেকে সদাশিব ঈশ্বর, বিদ্যা। শিবতত্ত্ব থেকে পরম শিব আর শক্তি।"

—"আর একহ'ল তূরীয়তত্ত্ব। মানে—তত্ত্বাতীত বস্তু। সমাধি হ'ল তত্ত্বাতীত অবস্থা। নির্বিকল্প সমাধিই তুরীয় অবস্থা।"

১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"সত্য কখনো ত্যাগ কোরবি নে। সত্য ত্যাগ কোর্‌লে সবই ত্যাগ করলি। ভগবান সত্যস্বরূপ। ঠাকুর সব ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু সত্য ত্যাগ করেন নি। তিনি ব'লেছিলেন—"মা এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে। মা এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।"

পণ করে সত্য আশ্রয় করে থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই সত্য ত্যাগ কোরতে নেই। তবে তো সত্যস্বরূপ ভগবানকে পাওয়া যায়। তিনিই সত্যি, আর সব মিথ্যে। দেখা যায় অসৎ ভাবে কাজ কোরেও, অনেকে জীবন বেশ সুখে কাটাচ্ছে। তাদের কিন্তু পরজন্মে আরও দুঃখে পড়তে হ'বে। ওদের এই রকম ভোগ বাসনা ছিল। তাই অসৎ ভাবে থেকে মনে কোচ্ছে বেশ আছি। এতো শেষ নয়! এর ফলে হয়ত পশু জন্ম লাভ করে এর প্রায়শ্চিত্ত কোরবে। বিষ খেলে তার ক্রিয়া হ'বেই।

এখন তুমি জেনেই খাও, আর না জেনেই খাও। ছোট ছেলে যদি বিষ খায় তো তার ক্রিয়া হ'বে না? ফল ভুগতেই হ'বে এ ঠাকুরের কথা।"

১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ সাল, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"ঠাকুরের তো সিদ্ধি ছিলই। অষ্টসিদ্ধাই তাঁর করতল গত হ'য়েছিল। তবে তিনি সেগুলিকে বিষবৎ ত্যাগ কোরেছিলেন। সিদ্ধাই কি জানিস? যেমন—হাওয়াতে হাত বাড়ালি অমনি রসগোল্লা এসে পড়ল। এই শূন্যে বেড়াবার ইচ্ছে হ'ল, অমনি তোর শরীর হাল্কা হ'য়ে গেল। সকলের সামনে নিজেকে লুকাবার ইচ্ছে হ'ল অমনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলি। এই সব আর কি। এ যদি কোরতে পারিস তো তুই খুব বড় সাধু হ'তে পারিস। কোনও তপস্যার দরকার হ'বে না। এখন লোকে এই তো চায়। দেখিস নে, সাধুর কাছে রোগ সারাবার জন্যে মাদুলী চায়।" (হাস্য)।

—"অষ্টসিদ্ধি যথা—'অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, মহিমা, খ্যাতি বা যশ। এই হ'ল মূল অষ্টসিদ্ধাই। আরও সিদ্ধাই আছে। অর্থ আর বোলতে পারিনে, তা ভাগবতে দেখিস, সব আছে।"

—"ভগবানকে লাভ কোরতে গেলে বিনা চেষ্টাতেই সিদ্ধাদি এসে যায়? ওর জন্যে খাটতে হয় না। ভগবানকে যদি পেতে চাস তো সিদ্ধাই ত্যাগ কোরতে হ'বে। এখন বুঝে দেখ্ কোনটা চাস্!"

২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"চিত্ত-শুদ্ধি কি এমনিই হয়? সৎ চিন্তা, শুদ্ধ চিন্তা কোরলে তবে চিত্ত-শুদ্ধ হয়। তখন মন স্থির করে জপ ধ্যান কোরতে পারবে। কিছুদিন অভ্যাস কোরতে হ'বে। জোর করেই প্রথম প্রথম বোসতে হ'বে, তারপর দেখবে এমনিই ঠিক ঠিক হ'য়ে যাবে।"

মায়াবাদের কথা চলিতেছিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—"তিনি ইচ্ছা কোরেছেন তাই সৃষ্টি হ'য়েছে। মায়াও তিনি দিয়েছেন আবার মায়াতীত অবস্থাও তিনি দিয়েছেন। মায়া, যোগমায়া ও মহামায়া তিনিই সব হ'য়েছেন। তুই তার বুঝবি কি? এ ব্রহ্মজ্ঞ না হ'লে বোঝা যায় না।"

১৭ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭

প্রাতে। স্বামিজী বলিতেছেন—"আজ নূতন বৎসর। এই দিনেই ঠাকুর কাশিপুর বাগানে আমাদের অনেককে "চৈতন্য হোক্" বলে আশীর্বাদ কোরেছিলেন এবং স্পর্শ কোরে আমাদেব কুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও আজ তোদের আশীর্বাদ কোরছি—তোদের চৈতন্য হোক্। তোরা এ বৎসর বেশ আনন্দে কাটাবি। আজ আমি ঠাকুরের সব ভক্তকে আশীর্বাদ কোবছি তাদের কল্যাণ হোক। আজ ঠাকুরেব কল্পতরু হওয়ার দিন। তোরা আজ ঠাকুরের বিশেষ পূজো কবিস। তাঁর কাছে প্রার্থনা কোববি। এই দিনে তিনি অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রেছিলেন। তোদেরও কোরবেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে বোলবি। আন্তরিক ভাবে বোলবি।"

১৮ই পৌষ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের অবতার। ঠাকুর তাঁকে অবতাব ব'লে গেছেন। প্রথম যীশুর কত কষ্ট পেতে হ'য়েছিল বোল দেখি? এখন সকলে তাঁকে পূজো কোর্‌ছে। বেঁচে থাকতে একটু জল পেলে না, এখন বৃষোৎসর্গ। (হাস্য) তাঁকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেল্লে! আমি এ বিষয় অনেক পড়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি তাঁকে যখন ক্রুশে দিয়েছিল তখন তাঁর একজন শিষ্য অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে যীশুর শরীর ভিক্ষা চেয়েছিল। যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা তাঁকে দিয়ে দিলে। এরা প্রচার ক'ল্লে যে যীশু মবে

এখন তুমি জেনেই খাও, আর না জেনেই খাও। ছোট ছেলে যদি বিষ খায় তো তার ক্রিয়া হ'বে না? ফল ভুগতেই হ'বে এ ঠাকুরের কথা।"

১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ সাল, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"ঠাকুরের তো সিদ্ধি ছিলই। অষ্টসিদ্ধাই তাঁর করতলগত হ'য়েছিল। তবে তিনি সেগুলিকে বিষবৎ ত্যাগ কোরেছিলেন। সিদ্ধাই কি জানিস? যেমন—হাওয়াতে হাত বাড়ালি অমনি রসগোল্লা এসে পড়ল। এই শূন্যে বেড়াবার ইচ্ছে হ'ল, অমনি তোর শরীর হাল্কা হ'য়ে গেল। সকলের সামনে নিজেকে লুকাবার ইচ্ছে হ'ল অমনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলি। এই সব আর কি। এ যদি কোরতে পারিস তো তুই খুব বড় সাধু হ'তে পারিস। কোনও তপস্যার দরকার হ'বে না। এখন লোকে এই তো চায়। দেখিস নে, সাধুর কাছে রোগ সারাবার জন্যে মাতুলী চায়।" (হাস্য)।

—"অষ্টসিদ্ধি যথা—'অনিমা, লঘিমা. প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, মহিমা, খ্যাতি বা যশ। এই হ'ল মুল অষ্টসিদ্ধাই। আরও সিদ্ধাই আছে। অর্থ আর বোলতে পারিনে, তা ভাগবতে দেখিস, সব আছে।"

—"ভগবানকে লাভ কোরতে গেলে বিনা চেষ্টাতেই সিদ্ধাদি এসে যায়? ওর জন্যে খাটতে হয় না। ভগবানকে যদি পেতে চাস তো সিদ্ধাই ত্যাগ কোরতে হ'বে। এখন বুঝে দেখ্‌ কোনটা চাস্‌!"

২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৬

স্বামিজী—"চিত্ত-শুদ্ধি কি এমনিই হয়? সৎ চিন্তা, শুদ্ধ চিন্তা কোরলে তবে চিত্ত-শুদ্ধ হয়। তখন মন স্থির করে জপ ধ্যান কোরতে পারবে। কিছুদিন অভ্যাস কোরতে হ'বে। জোর করেই প্রথম প্রথম বোসতে হ'বে, তারপর দেখবে এমনিই ঠিক ঠিক হ'য়ে যাবে।"

মায়াবাদের কথা চলিতেছিল। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—"তিনি ইচ্ছা কোরেছেন তাই সৃষ্টি হ'য়েছে। মায়াও তিনি দিয়েছেন আবার মায়াতীত অবস্থাও তিনি দিয়েছেন। মায়া, যোগমায়া ও মহামায়া তিনিই সব হ'য়েছেন। তুই তার বুঝবি কি? এ ব্রহ্মজ্ঞ না হ'লে বোঝা যায় না।"

১৭ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ১লা জানুয়ারী ১৯৩৭

প্রাতে। স্বামিজী বলিতেছেন—"আজ নূতন বৎসর। এই দিনেই ঠাকুর কাশিপুর বাগানে আমাদের অনেককে "চৈতন্য হোক্" বলে আশীর্বাদ কোরেছিলেন এবং স্পর্শ কোরে আমাদের কুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও আজ তোদের আশীর্বাদ কোরছি—তোদের চৈতন্য হোক্। তোরা এ বৎসর বেশ আনন্দে কাটাবি। আজ আমি ঠাকুরের সব ভক্তকে আশীর্বাদ কোরছি তাদের কল্যাণ হোক। আজ ঠাকুরেব কল্পতরু হওয়ার দিন। তোবা আজ ঠাকুরের বিশেষ পূজো কবিস। তাঁর কাছে প্রার্থনা কোববি। এই দিনে তিনি অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রেছিলেন। তোদেবও কোরবেন। কেঁদে কেঁদে তাঁব কাছে বোলবি। আন্তরিক ভাবে বোলবি।"

১৮ই পৌষ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের অবতার। ঠাকুর তাঁকে অবতার ব'লে গেছেন। প্রথম যীশুর কত কষ্ট পেতে হ'য়েছিল বোল দেখি? এখন সকলে তাঁকে পূজো কোরছে। বেঁচে থাকতে একটু জল পেলে না, এখন বৃষোৎসর্গ। (হাস্য) তাঁকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেল্লে! আমি এ বিষয় অনেক পড়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি তাঁকে যখন ক্রুশে দিয়েছিল তখন তাঁর একজন শিষ্য অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে যীশুর শরীর ভিক্ষা চেয়েছিল। যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা তাঁকে দিয়ে দিলে। এরা প্রচার ক'ল্লে যে যীশু মরে

গেছে কিন্তু ঐ ভক্ত তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুল্লে। তিনি ওখান থেকে পালিয়ে ভারতে আসেন। এ দেশেই তাঁর দেহ যায়। যীশুকে যেখানে সমাধি দেওয়া হয় সেখানে তাঁর কবরে একটী ছোট পাথরের মূর্তি তৈরী কোরে রাখা হ'য়েছিল। অনুসন্ধানে সেখানে শরীরের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। তবে ঐ মূর্তি থেকেই এখন তাঁর মূর্তি আঁকা হয়। তিনি ভারতে এসে অনেক যোগীর কাছে অনেক যোগও শিখেছিলেন। এসব বিষয় আমি তাদের দেশে থাকাকালিন অনেকবার ব'লেছি। তারা কোন মতই খণ্ডন কোরতে পারেনি। এসব ইতিহাস জান্‌তে অনেক খাট্‌তে হ'য়েছে। যারা প্রচারক তারা গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালাতে পারে না [১]।"

২০শে পৌষ সোমবার ১৩৪৩ সাল, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩৭

রাত্রিতে মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রী ম'র) কথা উঠিল। স্বামিজী বলিলেন—"আমি তাঁকে বোলতুম, তোমার মতামত কেন কথামৃতে চালিয়েছ? তুমি কি ভাবছ না ভাবছ তা লিখবার দরকার কি? তোমার ভাব তোমার থাক, লোকের নিজ নিজ ভাবে, ভাবতে দাও। তুমি শুধু ঠাকুরের ভাব দিয়ে যাও। তুমি কারও ভাব নষ্ট করো না। ঠাকুর বোলতেন—"কারও ভাব নষ্ট কোরতে নেই।" এই জন্যে আমি তাঁকে আরও বোলতুম—'কথামৃতে' একেতে ত্রিমূর্তি হ'য়েছ, যখন কিছু লেখ তখন শ্রীম, যখন কিছু বল তখন মাষ্টার, যখন কিছু ভাব তখন মণি। (হাস্য) আমায় কিছু বোলত না তখন চুপ কোরে থাকতো।

—কত লোক যে কথামৃত পড়ে শান্তি পেয়েছে তার সীমা নেই। ঠাকুরের কথা এত সহজ সরল যে, যে কোন লোক তা পড়লেই বুঝতে পারবে।

---

১ এই বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দজীর "কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ" দ্রষ্টব্য।

শ্রীম আমাকে পত্র লিখেছিল—'তুমি আমেরিকার জন্যে কথামৃতের ইংরাজী কোরতে পার, কিন্তু এসব দেশে চালালে আমার বাংলা 'কথামৃত' বন্ধ হ'য়ে যাবে। আমি তাই ক'রেছিলুম।"

২১শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ৫ই জানুয়ারী ১৯৩৭

ভোরে শয়নঘর হইতে আফিস ঘরে আসিতে আসিতে স্বামিজী স্বরচিত ঠাকুরের "বিশ্বস্য ধাতা' স্তবটী পাঠ করিতেছেন। ঘরে আসিয়াই বলিলেন—"কিরে? কেমন স্তব বল দেখি। মায়ের স্তব তুই জানিস? রোজ পুজোর পর দুটো একটা ক'রে স্তব পাঠ কোরবি। অর্থ চিন্তা কোরবি আর ধ্যান কোরবি। তাতে আনন্দ আসবে। জপ-ধ্যান দ্বারা, ভজনাদির দ্বারা, স্তব-স্তুতি দিয়ে শাস্ত্রাদি দিয়ে, যে কোন প্রকারেই হোক ভগবানের দিকে মনটা রাখতে হয়। এগুলি হ'ল অবলম্বন।"

২২শে পৌষ বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৭

আজ সকালবেলা স্বামিজী গান গাহিতেছেন—"ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি" ইত্যাদি। সহাস্যে বলিলেন—"তোদের চাইতে ভাল গাইতে পারি। তোরা কি গাইতে জানিস? তোদের গাওয়াকে গাওয়া বলে না। ঠাকুরের কখনও তাল-মান ভুল হ'ত না। তাঁর কণ্ঠ ছিল অতি মিষ্টি। যে তাঁর মুখের গান শুনেছে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। আমার তাঁর কণ্ঠের স্বর এখনও মনে আছে—ভুলতে পারিনি। আমরা অনেকেই গাইতে বাজাতে পারতুম।"

২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী ভোরবেলা নীচে আসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়াই বলিতেছেন—"নীচে যাচ্ছি দেখতে—সখীরা সব কেমন আছে।" বলিয়াই খুব হাসিতে

লাগিলেন। আবার বলিতেছেন—"কৃষ্ণ তো একজন? তিনি একমাত্র পুরুষ আর সব স্ত্রীলোক, সব তাঁর সখী। (হাস্ত) এখন আর চলতে পারিনে। এখন সেজে ব'সে আছি। ডাকলেই যেতে পারি। মাঠে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া উপরে গেলেন।

২৪শে পৌষ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৭

একটি ব্রহ্মচারীর পত্র আসিয়াছে। সেই সম্বন্ধে স্বামিজী বলিতেছেন—"ওর কেবল দুঃখ! সংসারের বন্দোবস্ত কোরতে পারলুম না। মায়ের কিছু ব্যবস্থা হ'ল না, বোনের ঋণ আছে ইত্যাদি!! দীক্ষাদি নিয়েছে জপ-ধ্যান কোরবে; তা নয় কেবল সংসারের কথা নিয়ে আমাকে বিরক্ত কোরবে। আমায় সাধন ভজন সম্বন্ধে কিছু জানাও, কিছু অসুবিধে হয় তো, তার কিছু উপায় কোরতে পারি। সংসারের সুখ সুবিধে আমাদের কাছে চাওয়া না চাওয়া সমান। ও তো গৃহীরা চাইবে। ভজনাদি করুক না; ওসব ঠিক হ'য়ে যাবে। ও নিজের ব্যবস্থা কোরতে পারে না, অন্যের ব্যবস্থা কি কোরবে? শরীর ভাল নয়, মন ভাল নয়; তা বাপু আমি কি কোরবো? পূর্বজন্মে কত কি করেছ, এ জন্মে তা ভুগতেই হ'বে।"

—"ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের চিন্তা করুক, তিনি সব অনুকূল[১] কোরে দেবেন। শরণাগত হ'য়ে ঠাকুরকে ধরে থাকুক না? এখানে সেখানে ঘুরলে কি হবে?"

২৫শে পৌষ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩৭

বৈষ্ণবদের কথা হইতে লাগিল। এই সম্বন্ধে স্বামিজী বলিলেন—"এত গোঁড়ামি ভাল নয়। আদর্শ থেকে নেমে গেছে। কোনটাতেই যে নিষ্ঠা

১ অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। গীতা ৯।২২

নেই। সন্তদাস বাবাজী এইজন্যে বাংলার গৃহস্থ বৈষ্ণবদের বেশ ব্যবস্থা কোরছেন—তোমরা মাছও খাও, মাংসও খাও। নতুবা কি তাঁর এত শিষ্য হত? (হাস্য) অনুরাগের সহিত হরিনাম না কোরলে কি ফল পাওয়া যায়? দেখ না, সারা জীবন মালা জপ্‌ছে আর তিলক কাট্‌ছে কিন্তু সঙ্কীর্ণতা পর্যন্ত যায় নি। একি ধর্ম নাকি? আমি অনেকের সঙ্গে মিশেছি; তারা কেউ বলেনা যে শান্তি পেয়েছি। যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা আবার দেখ, মালাও অত সঙ্গে রাখেন না—আবার তিলকের বাহারও নেই। ভিতর পবিত্র হ'ল না, তিলক কোরে কি হবে? ওতে আরও অহঙ্কার বাড়বে।"

২৬শে পৌষ রবিবার ১৩৪৩ সাল, ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"দেখ, এখন লোক দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি কি চাইবে। এখানে কত লোক আসে, কেউ বড় ধর্ম-টর্ম চায় না। সব আলু বেগুনের খ'দ্দের। কেউ বল্লে চাকুরী হ'ল না, কেউ বল্লে মেয়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছিনে—আশীর্বাদ করুন। কোথায় ধর্ম চর্চা কোরবে, তা নয়, এক'রে দিন ওক'রে দিন। আমি যেন ওসব কোর্তেই এসেছি আর কি? হাত দেখতে জান্‌লে, অসুখ ভাল কোরতে জান্‌লে, তার আর কোন অভাব থাকে না। কত যত্ন কোরবে, ভক্তি কোরবে। বিবেক-বৈরাগ্য, ভক্তি-বিশ্বাস কেউ চায় না। আসল বস্তুর সঙ্গে দেখা নেই, বিভূতি নিয়ে টানা-টানি। বিভূতিই যেন সব।"

২৭শে পৌষ সোমবার ১৩৪৩ সাল, ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৭

আজ জনৈক গৃহস্থ ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিতেছেন—"সংযমী হ'য়ে না থাকতে পার, বিয়ে থা' কোরে থাক। ব্যভিচার অত্যন্ত খারাপ। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করার মতন সুখের জীবন নেই। ভজন-

সাধন কোরবে আর শাস্ত্রাদি পাঠ কোরবে। অর্থাৎ মনটা এদিগে (ঈশ্বরাভিমুখে) ফেলে রাখতে হ'বে। মনের স্বভাব হ'ল একটাকে অবলম্বন করে থাকা। তাকে সৎভাব না দাও, অসৎ ভাব অবলম্বন কোরবে। তুমি ওসব ত্যাগ কর। এখন অসৎ স্বভাব ত্যাগ কর, নতুবা খুব ভুগতে হ'বে। শেষে আর শোধ্‌রাতে পারবে না। সাধুদের কাছে এসে বোস্‌বে। তাদের সঙ্গে মিশবে।"

১লা মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"খৃস্টানরা মন্ত্র নেয় বটে কিন্তু ঠিক ঠিক হিন্দু হয় না। তারা হিন্দুর দেব দেবী মেনে চলে না। তারা ব'লে রাম-কৃষ্ণ মানে রাম-খৃস্ট—একই কথা। আচার, রীতি-নীতি তাদের মতই থাকে তবে হিন্দুমতে সাধন ভজন করে। যারা ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়, তারা খাঁটি হিন্দুমতে চলে। তোদের যেমন ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস তেমনি ওদেরও দিতে হয়। আমি তো বেদ থেকে অনেক মন্ত্র তাদের ইংরেজী করে দিতুম। স্বামিজী মঠে এসে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের মন্ত্র করেন। আমিও কিছু কোরেছি। শশীমহারাজও কোরেছেন। পরে সব একত্র ক'রে এরকম ভাবে পুস্তকাকারে করা হয়। আমাদের এবিষয়ে অধিকার আছে। অন্য লোক এসব মন্ত্র কি ক'রে কোরবে। আমরা না কোরলে তোরা পেতিস কোথায়? নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি অনেক আছে। আমরা ঠাকুরের নিকট এসব শিখেছিলুম। ঠাকুর সব শিখিয়েছিলেন। খুব গোপনে আমাদের এসব শেখাতেন। কারো সামনে এসব কিছু বোলতেন না। অধিকারী না হ'লে ঠাকুর কাউকে কিছু দিতেন না।"

—"সাহেবদের আর তোদের মন্ত্রাদি কিছু কিছু তফাৎ তো হ'বেই। প্রেস মন্ত্র ইংরাজী কোরলে কি সেভাব থাকে? আমার এখানেও তো কয়েকজন সাহেব সাধু হ'য়েছিল।"

৩রা মাঘ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"ঠাকুরের বীজ মন্ত্র স্বামিজীই (বিবেকানন্দ) করেন। ঠাকুরই খুব সম্ভব তাঁকে এবিষয় বোলেছিলেন। ঠাকুরের বীজ হ'ল জগৎগুরুর বীজ। আর নীল সরস্বতীর বীজ। বীজ সংযুক্ত থাক্‌লে কোন দেবতার সঙ্গে কোন দেবতার গোলমাল হয় না। একনামে তো দুইজন নেই? থাক্‌লেও বীজ আলাদা আলাদা। দেবতার নাম ও বীজ এক হওয়া চাই। তবে তিনি দেখা দেন। নামের সঙ্গে বীজের যদি কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে তুমি যাকে চাও তিনি আসবেন না।"

৪ঠা মাঘ রবিবার ১৩৪৩ সাল, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"আমেরিকাতে ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছে; সন্ন্যাসীও অনেক হ'য়েছে। আমি থাকতেও কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্য আর কয়েকজনকে সন্ন্যাস দিয়েছিলুম। তাঁরা এখনও কেউ কেউ বেঁচে আছে। এই তো অতুলানন্দ একজন। একটী মেয়েকেও সন্ন্যাস দিয়েছিলুম। তার বিশেষ আগ্রহ, তাই কিছু কিছু বাদ দিয়ে তার উপযোগী ক'রে দিয়েছিলুম। তারা কিন্তু কেউ পালিয়ে যায় নি। এই সঙ্ঘের জন্যে তারা খুব খেটেছে। তারা একটা গ্রহণ কোরলে ছেড়ে বাড়ী পালায় না।"

—"ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা সব মন্ত্রেই দীক্ষা দিতে পারেন। আমিও তো দিতে পারি। আগে তাই দিতুম। এখন দেখ্‌ছি সব ঠাকুরের সঙ্গে এসে মিশেছে। এখন যথাসম্ভব ঠাকুরের মন্ত্রেই দীক্ষা দি। এতে যদি কারো বিশ্বাস না হয়, তো বলি অন্য গুরু দেখগে। বুঝি, তাঁদের এখনও ঢের বাকি। ঠাকুরের মধ্যে সব অবতার এসে এসে মিলিয়ে গেছিল। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, রাম, শিব, কালী সব। তাই তাঁর নামে সব চল্‌তে পারে। এতে দোষ নেই। কিছুদিন পর এসব বুঝতে পারবে।"

৬ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"সাধারণতঃ মানুষ জন্মের পর মানুষই হয়, নীচ যোনিতে জন্ম হয় না। মানুষ জন্মেই, কারো কারো পশুভাব থাকে। কারো মধ্যে গরুর, কারো মধ্যে সাপের, আবার কারো মধ্যে বাঘের প্রবৃত্তি থাকে। পশুভাব থাকলেই পশুর মত ভোগ করে, সেই জন্যে মানুষ হ'য়েও পশু। এ শরীর দিয়েই পশুর মত ভোগ করে। তবে যদি ভরত-রাজার মত কারো মৃত্যুকালে সে ভাব থাকে তো পশু হ'বে। এজন্যেই তো বলি এ মানুষ জন্ম পেয়েও যদি কিছু সৎসংস্কার নাই কোর্ত্তে পারলে তো মানুষ জন্মই বৃথা হ'ল।"

—"মৃত্যুতে কেবল স্থূল শরীর যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে সব সংস্কার থাকে। শরীর কি কিছু ভোগ করে? মনই সব ভোগ করে। সেখানেও তো তোর মন থাকে, এজন্যে সেখানেও সুখ দুঃখ বোধ থাক্‌বে। যেমন কর্ম কোরবি তেমন স্থানে, তেমন আবহাওয়ায় তোর জন্ম হ'বে। তুই এই শরীর এই মন কোথা থেকে পেলি? এ তুই কর্মের দ্বারা কোরেছিস। যাদের বাসনা ত্যাগ হ'য়েছে, তারাই মুক্ত হ'তে পারে, আর কেউ নয়। মুক্ত হ'তে গেলে সাতটী স্তর পেরিয়ে যেতে হয়। তার পরের অবস্থা হ'ল বাক্য-মনের অতীত অবস্থা। বৈতরণীর দ্বারা সব ভাগ করা হ'য়েছে। ইচ্ছে কোরলেই মুক্ত হওয়া যায় না। সেইজন্যে সাধন কোরতে হয়।"

৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৭

সমিতিতে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আনা হইয়াছে। তাই স্বামিজী খুব আনন্দ করিতেছেন আর বলিতেছেন—"বল বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণম্

গচ্ছামি, ধর্মং শরণম্ গচ্ছামি। বল,—ওঁ মণিপদ্মে হুঁং। এই হ'ল বুদ্ধের ত্রিমন্ত্র। বুদ্ধের মত হৃদয়বান্ হ'তে হ'বে, নইলে শুধু বুদ্ধের মূর্তি এঁকে কি হ'বে? দেখ, জীবের কল্যাণের জন্যে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ কোরলেন। কি ক'রে জীবের দুঃখের নিবৃত্তি হয়, এই নিয়ে তিনি কি কঠোর সাধনা আরম্ভ কোরেছিলেন। তাঁর ভাব এখনও লোকে ঠিক ঠিক নিতে পারেনি। তাই বাড়ীর সদর দরজায় একটা বুদ্ধ মূর্তি বসিয়ে দিলে। এতে দেব-মূর্তির, অবতার মূর্তিব অবমাননা করা হয়। এই জন্যে স্বামিজী (বিবেকানন্দ) ঠাকুরের মূর্তি কোরতে নিষেধ কোরেছিলেন।"

৯ই মাঘ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ২২শে জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"শিষ্য করা ভারি কঠিন। গুরুকে শিষ্যেব দায়িত্ব নিতে হয়। কিসে শিষ্যের কল্যাণ হ'বে, তা গুরুর ভাবতে হয়। যে গুরু শিষ্যেব আত্মিক কল্যাণ কামনা না করে, সে গুরু, গুরু হওয়ার উপযুক্ত নয়।"

—"ছেলে হ'লে আরও কঠিন। শিষ্য তবু বেছে নেওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী তাই বোলেছেন ছেলেব চাইতে শিষ্য ভাল। কারণ তাঁর ছেলে যে মুসলমান হ'য়ে গেছিল গো! শিষ্যের ভাব নিয়েও ভূগতে হয়। শিষ্য যদি গুরুর নির্দেশ মত না চলে, তো তাড়িয়ে দিলে চলবে কিন্তু ছেলে তাড়ালেও সে বোলবে, যে আমি অমুকের পুত্র। অন্যের ভার নিলে তার পাপ তাপও নিতে হ'বে, ভুগতেও হয় অনেক। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষবা তাইতো অত ভুগছে। এইজন্যে অনেকে বেশী শিষ্য কোরতে চায় না।"

১০ই মাঘ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"তোমরা পুরুষ হ'য়ে জন্মেছ, কত সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছ। মেয়েদের চাইতে তোমাদের সুবিধে অনেক বেশী। সৎসঙ্গ কোরতে পার,

নির্জনে গিয়ে ভজনাদি কোরতে পার। মেয়েদের কিন্তু ওতে ভয় আছে। তেমনি মেয়েদের কম খাটলেই বেশী ফল পায়। তোমাদের মত ওদের মন অত বহির্মুখী নয়। দেখনা, মেয়েদের কি শ্রদ্ধা, কি নিষ্ঠা—এত সব সুবিধে পূর্বজন্মের সুকৃতি। আমাদের দেশের মেয়েদের সেবা-ভক্তির তুলনা হয় না। আবার দেখ, মুখটি বুজে সংসারের সব কাজ কোরে যাচ্ছে।"

একটী ব্রহ্মচারী সমিতি হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বামিজী বলিতেছেন—"কিগো আজকাল কেমন চল্‌ছে? আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর রয়েছেন। ভগবান যাঁর সহায়, ছুনিয়ার লোকে তাঁর কি কোরতে পারে? আমরা তাঁর সন্তান, আমাদেরও যারা আদর্শ নেবে, মেনে চল্‌বে, তাদেরও কল্যাণ হ'বে। ঠাকুর তাদের সহায় থাক্‌বেন।"

১২ই মাঘ সোমবার ১৩৪৩ সাল, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩৭

বুদ্ধ-মূর্তির কথা হইতেছিল। স্বামিজী অনেকগুলি ফটো বাহির করিয়া দেখাইতেছেন; আর বলিতেছেন—"তখন তো ফটোর জন্মই হয় নি, বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ এঁদের ঠিক ঠিক ফটো কোথায় পাবে? তখন সব পাথরে খোদাই ক'রে এবং তৈল-চিত্রে মূর্তি আঁকা হ'ত। এখন তো তখনকার চাইতে ফটোর খুব উন্নতি হ'য়েছে। তখনও এমন সব শিল্পী ছিল যে, একজনকে দেখে ঠিক ঠিক মূর্তি তৈরী কোরতে পারত। এসব মূর্তি তো ভক্তেরা কোরেছে। তারা যেমন দেখেছে, তেমনটী ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কোরেছে। এজন্যে কোন মহাপুরুষেরই মূর্তি বা ফটো ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। এঁদের অনেক গুলিই কাল্পনিক বোল্‌তে হ'বে।" বিভিন্ন আলোচনাদির পর পুনরায় বলিতেছেন—"কিরে ধ্যান-ট্যান কেমন হ'চ্ছে?

বুদ্ধের মত[1] ধ্যানী হবি। আমি তো সব সময়ই বলি অভ্যাস কর। আমি কত কঠোর অভ্যাস ক'রেছি। বরানগর মঠে চিৎ হ'য়ে ধ্যান কোরতুম, আবার অসুবিধে হ'লে ব'সে ধ্যান কোরতুম। সারারাত এভাবে কাটিয়ে দিতুম। অভ্যাস কর, তোরাও পারবি। ঘুম পেলে উঠে একটু পায়চারী ক'বে আবার ধ্যানে ব'সে যাবি। অভ্যাস, অভ্যাস, অভ্যাস চাই নতুবা হ'বে না।"

১৪ই মাঘ বুধবার ১৩৪৩ সাল, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"তোমরা তাঁর শরণাগত হও। নতুবা কি ক'রে তাঁর মায়া থেকে রক্ষা পাবে? তাঁর কৃপা না পেলে, কেউ এগুতে পারবে না। আর প্রার্থনা কর, ভক্তি বিশ্বাস পাবার জন্যে। বিশ্বাস না হ'লে কিছু হয় না। বিশ্বাস ক'রে যে ভাবেই ডাক না কেন সে ভাবেই তিনি দেখা দেবেন। স্ত্রীভাবেই হোক, আব পুরুষভাবেই হোক, একটার প্রতি বিশ্বাস ক'বে ধবে থাক।"

—"তোমাদেব ঘুম এত বেশী যে হিসাব কোরে দেখ, জীবনের অর্ধেক সময় ঘুমিয়ে কাটাচ্ছ। আবার এমনও পাবে অর্ধেকের বেশীও ঘুমিয়ে কাটায়। আমি কয় ঘণ্টা ঘুমুই। আমেরিকায় যখন ছিলুম তখন মাত্র দুই তিন ঘণ্টা ঘুমুতুম। নতুবা পারবো কেন? একা কত কাজ কোরতে হ'ত। সপ্তাহে তিন চারটে বক্তৃতা, আবার ক্লাস, বাইরের লোককে উপদেশ দেওয়া। নিজে আবার পড়াশুনা কর্তে হ'ত। নিজেকেই চিঠি পত্র, হিসেবাদি সব কোরতে হ'ত। আবার তাতে আমাব থাক্‌বার নির্দিষ্ট স্থান ছিল না।

---

১ ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥—বুদ্ধদেব

নির্জনে গিয়ে ভজনাদি কোরতে পার। মেয়েদের কিন্তু ওতে ভয় আছে। তেমনি মেয়েদের কম খাটলেই বেশী ফল পায়। তোমাদের মত ওদের মন অত বহির্মুখী নয়। দেখনা, মেয়েদের কি শ্রদ্ধা, কি নিষ্ঠা—এত সব সুবিধে পূর্বজন্মের সুকৃতি। আমাদের দেশের মেয়েদের সেবা-ভক্তির তুলনা হয় না। আবার দেখ, মুখটি বুজে সংসারের সব কাজ কোরে যাচ্ছে।"

একটী ব্রহ্মচারী সমিতি হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বামিজী বলিতেছেন—"কিগো আজকাল কেমন চলছে ? আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর রয়েছেন। ভগবান যাঁর সহায়, দুনিয়ার লোকে তাঁর কি কোরতে পারে ? আমরা তাঁর সন্তান, আমাদেরও যারা আদর্শ নেবে, মেনে চল্‌বে, তাদেরও কল্যাণ হ'বে। ঠাকুর তাদের সহায় থাক্‌বেন।"

১২ই মাঘ সোমবার ১৩৪৩ সাল, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩৭

বুদ্ধ-মূর্তির কথা হইতেছিল। স্বামিজী অনেকগুলি ফটো বাহির করিয়া দেখাইতেছেন ; আর বলিতেছেন—"তখন তো ফটোর জন্মই হয় নি, বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ এঁদের ঠিক ঠিক ফটো কোথায় পাবে ? তখন সব পাথরে খোদাই ক'রে এবং তৈল-চিত্রে মূর্তি আঁকা হ'ত। এখন তো তখনকার চাইতে ফটোর খুব উন্নতি হ'য়েছে। তখনও এমন সব শিল্পী ছিল যে, একজনকে দেখে ঠিক ঠিক মূর্তি তৈরী কোরতে পারত। এসব মূর্তি তো ভক্তেরা কোরেছে। তারা যেমন দেখেছে, তেমনটী ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কোরেছে। এজন্যে কোন মহাপুরুষেরই মূর্তি বা ফটো ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। এঁদের অনেক গুলিই কাল্পনিক বোল্‌তে হ'বে।" বিভিন্ন আলোচনাদির পর পুনরায় বলিতেছেন—"কিরে ধ্যান-ট্যান কেমন হ'চ্ছে ?

বুদ্ধের মত[১] ধ্যানী হবি। আমি তো সব সময়ই বলি অভ্যাস কর। আমি কত কঠোর অভ্যাস ক'রেছি। বরানগর মঠে চিৎ হ'য়ে ধ্যান কোরতুম, আবার অসুবিধে হ'লে ব'সে ধ্যান কোরতুম। সারারাত এভাবে কাটিয়ে দিতুম। অভ্যাস কর, তোরাও পারবি। ঘুম পেলে উঠে একটু পায়চারী ক'রে আবার ধ্যানে ব'সে যাবি। অভ্যাস, অভ্যাস, অভ্যাস চাই নতুবা হ'বে না।"

১৪ই মাঘ বুধবার ১৩৪৩ সাল, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"তোমরা তাঁর শরণাগত হও। নতুবা কি ক'রে তাঁর মায়া থেকে রক্ষা পাবে? তাঁর কৃপা না পেলে, কেউ এগুতে পারবে না। আর প্রার্থনা কর, ভক্তি বিশ্বাস পাবার জন্যে। বিশ্বাস না হ'লে কিছু হয় না। বিশ্বাস ক'রে যে ভাবেই ডাক না কেন সে ভাবেই তিনি দেখা দেবেন। স্ত্রীভাবেই হোক, আর পুরুষভাবেই হোক, একটার প্রতি বিশ্বাস ক'রে ধরে থাক।"

—"তোমাদের ঘুম এত বেশী যে হিসাব কোরে দেখ, জীবনের অর্দ্ধেক সময় ঘুমিয়ে কাটাচ্ছ। আবার এমনও পাবে অর্দ্ধেকের বেশীও ঘুমিয়ে কাটায়। আমি কয় ঘণ্টা ঘুমুই। আমেরিকায় যখন ছিলুম তখন মাত্র দুই তিন ঘণ্টা ঘুমুতুম। নতুবা পারবো কেন? একা কত কাজ কোরতে হ'ত। সপ্তাহে তিন চারটে বক্তৃতা, আবার ক্লাস, বাইরের লোককে উপদেশ দেওয়া। নিজে আবার পড়াশুনা কর্তে হ'ত। নিজেকেই চিঠি পত্র, হিসেবাদি সব কোরতে হ'ত। আবার তাতে আমার থাক্‌বার নির্দিষ্ট স্থান ছিল না।

---

১ ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥—বুদ্ধদেব

ছ বৎসর এইভাবে থাকবার পর, তবে একটা ঘর ভাড়া ক'রে থাকবার মত টাকা হ'ল। পরে নিজেদের বাড়ীও হ'য়েছিল। তাইতো স্বামিজী শেষবার যখন গেলেন তখন আমায় বল্লেন—"এতদিন পর তুমি দাঁড়াবার মত একটা স্থান কর্ত্তে পাল্লে। একমাত্র তুমিই, আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে নিজে দাঁড়াতে পেরেছ।"

আমি প্রথম যখন যাই তখন তাঁকে বোলেছিলুম যে—"তোমার পরিচিতদের সঙ্গে আমার পরিচয় কোরে দাও।" তখন তিনি বোলেছিলেন —"আমার পরিচিত কেউ নেই। তুমি নিজে সকলের সঙ্গে পরিচয় কোরে নাও।" আমার কাজ দেখে স্বামিজী খুব খুসী হ'য়েছিলেন।"

১৭ই মাঘ, শনিবার ১৩৪৩ সাল, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"তোরা তো আমার কথা শুনবিনে? দেখ যীশু বোলেছিলেন —"যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।" পিতা হ'তেই তো পুত্রের জন্ম? একে যে দেখেছে সে ঠাকুরকেই দেখেছে। এর ভেতর ঠাকুরেরই অংশ রয়েছে, কি বলিস? (হাস্য) তিনি আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। এই জন্যেই তো তোদের বলি, আমাদের কথা শুনিস্।"

একটী যুবক সাধু হইতে আসিয়াছে, তাহাকে বলিতেছেন—"সাধু হ'লেই হ'ল না, সাধু হ'য়ে তপস্যা কোরতে হয়। সারাজীবন এভাবে কাটিয়ে দিতে হ'বে। বেশ কোরে ভাব। শেষে পালাতে পারবে না। কত কঠোরতা কোরতে হ'বে। তবে তো থাকা যায়? এপথ সবাই গ্রহণ কোরতে পারে না। বিবেক, বৈরাগ্য ঠিক ঠিক না হ'লে থাকতে পারবে না। ফিরে ঘরে যেতে হ'বে। এখন বেশ কোরে ভেবে পথ ঠিক কর। না হয় সৎভাবে সংসারেই থাকগে। সংসার কোরতে তো দোষ নেই? সংসারে জড়িয়ে পড়াই দোষ। রুটিন কোরে ভজনাদি কোরবে আর সংসারের

কাজ কোরবে। ভগবানে মতি রেখে সংসারে থাক্‌লে বন্ধন আপনিই কেটে যাবে। রোজ রোজ এভাবে ভজনাদি সহায়ে কাজ কোরে যাও, দুদিন আগেই হোক আর দুদিন পরেই হোক, আসক্তি দিন দিন ক'মে যাবে। তাতে যদি মনে শান্তি না পাও, তবে আমার কাছে আস্‌বে।"

১৮ই মাঘ রবিবার ১৩৪৩ সাল, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৩৭

সন্ধ্যায় কয়েকজন স্ত্রীভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গেলে স্বামিজী বলিলেন—"দেখ, দীক্ষা নিতে এসেছে। অথচ আগে একবার দীক্ষা হ'য়ে গেছে। গুরুর উপর বিশ্বাস নেই। সেখানে যখন বিশ্বাস নেই, এখানে বিশ্বাস হ'বে কি? যার বিশ্বাস হয়, তার সব জায়গাতেই হয়। তবে যদি গুরু অসৎ হয় তবে কথা আলাদা। পূর্বে ভাবা উচিত ছিল। এক জন্মে পাঁচজন গুরু! একি ছেলে খেলা নাকি? যাকে তুই ধর্মের পথপ্রদর্শক কোরবি, তাকে যাঁচাই কোরে নিবিনে? ঠাকুরকে তাঁর ছেলেরা কতভাবে পরীক্ষা ক'রে তবে বিশ্বাস কোরেছে। তাই দেখ,— একজনও ফিরে ঘরে যাযনি। যেমনি গুরু তেমনি চেলা। এখনো তাঁর অন্তরঙ্গরা বেঁচে আছে, তাই যাতা কোরতে তোরা পারিসনে। এর পব কি হ'বে কে বোল্‌বে?"

১৯শে মাঘ সোমবার ১৩৪৩ সাল, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"তোরা এদেশের মেয়েদের ভক্তি করিস না ছাই করিস; শুধু মুখেই বলিস এরা শক্তিরূপিণী, মায়ের অংশ, জগৎমাতার অংশ; কিন্তু কাজের বেলায় পীঠে লাঠি মারিস্। ইয়োরোপ আমেরিকায় কিন্তু তা নয়, তারা মেয়েদের কেমন সম্মান দেয়। মেয়েদের আগে আসন দেবে। আর তোদের দেশের মেয়েরা রাস্তায় চল্‌তে পারে না, টেনে নিয়ে যায়। এমন

পশু-প্রবৃত্তি ; ছিঃ, ছিঃ ! পরাধীন দেশ এই জন্যেই এসব হ'চ্ছে। জাতির চরিত্র উন্নত না হ'লে ধর্ম বলিস, অর্থ বলিস, স্বাধীনতা বলিস, সব যাবে। তোদের হ'য়েছেও তাই। এখন দেখ পৌনে দু'শ বৎসর পরাধীনতায় ভুগছে। হিন্দু তোরা আরও কাপুরুষ হ'য়েছিস। স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেল, বোনকে টেনে নিয়ে গেল, আর পুরুষগুলো ভয়ে পালিয়ে যায়। নিজের স্ত্রীকে ফেলে স্বামী পালিয়ে যায়, এ আর কোথাও দেখবে না। মেয়েদের বীর হওয়ার সুযোগ দাও, তখন তারাই দেখবে,—তোমাদের শাসন কোরতে পারবে। মেয়েদের সবদিক দিয়ে শিক্ষে দিতে হ'বে। এদের স্বাধীনতা না দিলে, দেশও স্বাধীন হ'তে পারে না। এরা শক্তিরূপিণী, শক্তির উৎস। পুরুষরাই মেয়েদের বেশী খারাপ ক'রে। কোন মেয়ে, পুরুষকে খারাপ কোরেছে শুনেছিস্ ? বরং পুরুষরাই জোর কোরে মেয়েদের খারাপ পথে টেনে নিয়েছে। শুধু মেয়েরাই কামুক নয়। তাদের চাইতে পুরুষরাই অধিক অসংযমী। মেয়েরা কেমন সংযমী ; বিধবাদের দেখতো ? কটা পুরুষ ওভাবে ব্রহ্মচর্য পালন কোরতে পারে ? আমাদের দেশের মেয়েরা রাজ্যশাসন কোরেছে, যুদ্ধ কোরেছে, আবার নিজের ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়ে গৌরব বোধ কোরেছে। এখন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের শেখাতে হ'বে, তোমরা অবলা নও, তোমরা বীর নারী। পাহাড়ী মেয়েদের দেখ,—তারা যেমন কাজ কোরতে পারে, তেমন বোঝা বইতে পারে, আবার লড়াইও কোরতে পারে। ওরা ছেলেবেলা থেকে স্বাধীন ভাব পাচ্ছে কিনা, তাই।"

২০শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

অদ্য স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব। স্বামিজী দীক্ষাদানের জন্য এগারটার সময় নীচে আসিলেন। দীক্ষাদি হইয়া গেল। ভক্তদের বলিতেছেন—"যে ভাবেই সাধন কর না কেন, মা দ্বার খুলে না দিলে

উপায় নেই। অবশ্য ঠাকুরকে ধরলেই মাকেও ধরা হয়। যেমন শিব আর শক্তি, অভেদ। পিতাপুত্রের মত, মা-ছেলের মত, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ কোরে নিতে হয়। আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, তোমাদের ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি হোক।"

—"তাঁকে খুব ডাক্‌বে, খুব প্রার্থনা কোরবে। তোমরা সব তাঁর ছেলে।"

সেবক স্বামিজীর পায়ে তৈল মালিস করিয়া দিবার সময় পা নখের আঁচড়ে কাটিয়া গিয়াছে। তিনটের সময় নীচে আসিয়াছেন; কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"দেখ, বেটা পা কেটে দিয়েছে, এই দেখ এখনো রক্ত পড়ছে। কি হতভাগা! গুরুর রক্তপাত ক'ল্লে? এতে পাপ হয়। ওকে বলেছি প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হ'বে,—তিনলক্ষ জপ আর তিন দিন উপবাস। কিন্তু ওর পাপ-পুণ্য জ্ঞান নেই। ওরকম সেবক হ'লেই হ'য়েছে আর কি; বলনা?—"পড়েছি দুর্জনের হাতে, রক্ষা নেই কোন মতে।" আমারও হ'য়েছে তাই। ইচ্ছে ক'রে দূর কোরেদি। আবার মনে হয় থাক বেটা কোথায় যাবে। (হাস্য) সেবার দ্বারা যদি গুরুর কষ্টই হ'ল তবে সেবায় কোন ফল হয় না। ভূতের দ্বারা কোন সেবা হয় না। তোরা এক একটা ভূত এসেছিস।"

তৎপর স্বামিজী, স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আহূত সভায় গিয়া বসিলেন এবং সভাপতি হইলেন। বক্তৃতা করিলেন না। শ্রীযুক্ত ভূপেনবাবু (স্বামী বিবেকানন্দর ভ্রাতা) বক্তৃতা দিয়াছিলেন, আরও অন্য কেহ কেহ বক্তৃতা করিলেন।

২১শে বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

বৈকাল ছয়টার সময় স্বামিজী গৌরীমার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। গৌরীমার সম্মুখে বসিবার আসন দেওয়া হইয়াছিল, গৌরীমা স্বামিজীর

চিবুক ধরিয়া চুমু খাইলেন এবং বলিলেন—"আমি তো অথর্ব, তুমি এখনো চলতে ফিরতে পার। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা কোরতে এসো।"

তারপর গৌরীমা স্বামিজীকে অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"নরেনের পর তুমিই তো বোলতে কইতে পার, নইলে আর কেউ নেই। ঠাকুরও তো বোলেছেন—'নরেনের পর কালী জ্ঞানী।' তুমি তো জগতের জন্যে অনেক কিছু কোরে গেলে।"

স্বামিজী ব'ল্লেন—"দেখুন, সেই দক্ষিণেশ্বরের কত ঘটনা, কত কথাই এখন মনে হয়। ঠাকুরের সময় কত ঘটনাই হ'য়ে গেছে। এখন সে আনন্দও নেই, আর সে চন্দ্রও নেই। তাঁর অপার করুণা, তাঁর অপার করুণা।"

২৩শে মাঘ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"রুদ্রাক্ষ, তুলসী আরও অনেকপ্রকার মালা আছে। শঙ্খ-মালা দিয়েও জপ করা চলে। এও বেশ পবিত্র। স্ফটিকও পবিত্র। তিব্বতে দেখলুম, মানুষের হাতের আঙ্গুলের মালা পরে, মানুষের কপালের মালা পরে, পায়ের উরুর হাড় দিয়ে বাঁশী তৈরী করে, এ দার্জিলিংএ দেখেছি। যারা ওসব মালা বা বাঁশী ব্যবহার কোরে তাদের উগ্রদণ্ডী বলে। এসব তন্ত্রের ব্যাপার। আবার, নরমুণ্ডে ভিক্ষে কোরে খায়। ওদের এই একটা সাধন। এরদ্বারা বিভূতি লাভ হয়। এরা আবার অনেকে ম্যাজিক দেখিয়ে পয়সা আদায় করে।"

২৪শে মাঘ শনিবার ১৩৪৩ সাল, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"মহেন্দ্র দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দজীর ভ্রাতা) ঠাকুরকে কয়েকবার দেখে থাকবে। গৌরীমা? তিনিতো ঠাকুরের নিকট মন্ত্রও

নিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরকে অনেকবার দেখেছেন। মহেন্দ্র দত্ত তো তখন ছেলেমানুষ। আমাদের চাইতে দুই তিন বৎসর ছোট। ঠাকুর যখন (কলিকাতার) সিমলা পল্লীতে আস্‌তেন তখন স্বামিজীকে ডেকে আন্‌তো। মহেন্দ্র এইভাবে ঠাকুরকে দেখেছে। তাঁকে বুঝতে না পারলে, তাঁর ভাবধারা নিতে না পারলে, দেখা না দেখা সমান। তাঁর ভাব ধরা শক্ত। কোন বিভূতির প্রকাশ নেই। যাঁরা তাঁর সেবা কোরেছে, তারাই তাঁর ঠিক ঠিক শিষ্য। তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে ঠাকুরের কাছেই দিনরাত্রি পড়ে থাক্‌তো। তবুও শিষ্যেরা কি বুঝতে পেরেছে যে, স্বয়ং ভগবানই এসেছেন ? তাহ'লে তো এত পরীক্ষাই কোরতো না। ঠাকুরই বোলতেন—"এবার রাজার গুপ্তভাবে রাজ্যদর্শন কোরতে আসা।"

২৫শে মাঘ রবিবার ১৩৪৩ সাল, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

সকাল বেলা স্বামিজী বলিতে লাগিলেন—"দেখ আজ আমার কি যেন একটা অভাব বোধ হ'চ্ছে, বুঝতে পাচ্ছি নে ! গঙ্গাধর মহারাজের শরীর খুব খারাপ মঠে নিয়ে এসেছে। কি হ'বে বুঝতে পাচ্ছি নে। একে একে সব চলে যাচ্ছে। আমরাই কতদিন আর থাকবো তিনিই জানেন।"

বৈকাল তিন ঘটিকার সময় গঙ্গাধর মহারাজের স্থূল শরীর গিয়াছে—টেলিফোন আসিয়াছে। স্বামিজীকে বলা হইল। শুনিয়াই তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"গিয়েই বা কি হবে ! লোক দেখানো গিয়ে লাভ নেই। গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল রে ! যাক্, ঠাকুরের কাছেই গেল। তাঁর কাজ শেষ হ'য়েছে।"

স্বামিজী মঠে গিয়া গঙ্গাধর মহারাজের মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটী ফুলের তোড়া দিলেন এবং গলে মালা পরাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে

সমাধি স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অগ্নি-সংযোগ অন্তে কলিকাতা ফিরিলেন।

রাত্রিতে বলিতেছেন—"তিনি (ঠাকুর) আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আবার একে একে তাঁর পায়ে টেনে নিচ্ছেন। দুঃখের কি আছে? তাঁর ইচ্ছায় আসা, আবার তাঁর ইচ্ছায়ই যাওয়া। ঠাকুরের কাজ কোরতে এসেছি, কাজ শেষ হ'লে তিনিই ডাকবেন। আমরা তো প্রস্তুত হ'য়েই আছি।"

গঙ্গাধর মহারাজের পত্রাদি বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিলেন আর বলিলেন—"গঙ্গাধর মহারাজ আমায় খুব মান্‌তো। প্রায়ই চিঠি দিত। শেষ পর্যন্তও আমায় চিঠি দিয়েছে। সে স্বামিজীকে খুব ভক্তি কোরতো। স্বামিজীও (বিবেকানন্দ) আবার তাঁকে খুব স্নেহ কোরতেন।"

২৬শে মাঘ সোমবার ১৩৪৩ সাল, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

ঠাকুরের সন্তানদের কথা হইতেছে; স্বামিজী বলিতেছেন—"আমরা যখন কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে আছি, তখন গঙ্গাধর মহারাজ, হরিপ্রসন্ন মহারাজ, এরা নিজেদের বাড়ীতেই থাকতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আস্‌তেন। ঠাকুরকে হরিপ্রসন্ন মহারাজ খুব কম দেখেছেন। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁর চাইতে বেশী দেখেছেন, মিশেছেন। তারপর তুলসী মহারাজ। আমরা যখন ঠাকুরের কাছে গেরুয়া পাই, তখন গঙ্গাধর মহারাজ ওখানে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বোলেছিলেন—"তুই নরেনের কাছ থেকে নিস।" তবে ঠাকুর এঁদের দীক্ষাদি দিয়ে গেছ্‌লেন।"

—"তোদের ওসব কথায় কাজ কি? জেনে রাখ, যাঁরা একদিনও ভগবানের সঙ্গ কোরেছে, মুক্ত পুরুষদের কৃপা পেয়েছে তাঁরা ধন্য। যারা ঠাকুরের নামে, তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ কোরেছে, তারাই তাঁর সন্তান। অত

বিচার কোরে কি হবে? দলাদলি করিসনে। তুই দেখ, তোর কি হ'ল। তিনি কাকে কি বোলেছেন, না বোলেছেন, তা দিয়ে দরকার কি?"

২৭শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

সকালবেলা। কয়েকজনের দীক্ষা হইবে। প্রথমে বলিলেন—"নীচে যাওয়া হ'বেনা, উপরেই দীক্ষা হ'বে।" যথা সময়ে সংবাদ দিতে গিয়াছি বলিলেন—"না চল, নীচেই যাচ্ছি।" দীক্ষার্থীদের বলিলেন—"দেখ, তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছে, মন্দিরেই দীক্ষা হয়, বুঝতে পেরে নীচেই এলুম। না হ'লে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হ'ত না। এবার হ'লত? কি বল? (হাস্য) আমি বেশীক্ষণ নীচে আসনে বোসতে পারিনে, কষ্ট হয়। তাই উপরের চেয়ারে বোসেই দীক্ষা হ'লে ভাল হয়। চেয়ারে বোস্‌তে কোন কষ্ট হয় না। শরীরটা খুব মোটা হ'য়ে গেছে কিনা?" (হাস্য)

রাত্রিতে বলিতেছেন—"আজকাল তো খুব দীক্ষা নিতে আস্‌ছে। যত লোক দীক্ষা নেয়, তার অর্দ্ধেক লোকও যদি তাঁর নাম করে তো যথেষ্ট। কিছুদিন বেশ অনুরাগের সহিত ভজন কোরতে থাকে, তারপর ছেড়ে দেয়। বলে কিনা আনন্দ পাইনে। দুই চার মাস কোরেই যদি আনন্দ আসবে তো সকলেই পারতো! তবে তোমাদের সেরূপ তীব্র বৈরাগ্য কৈ? ঠাকুরতো বোলেছেন—"তিন টান হ'লে একদিনেই হ'তে পারে।" তোরা সেরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভজনাদি কর তাহ'লে তিন মাস কেন, তার আগেই হ'বে। আবার ব'লে মন স্থির কোরে দিন। মন স্থির কি এমনি হয়? ভজনাদি কর, প্রার্থনা কর, তোমার মন স্থির হ'বেই। আমি তো মন্ত্র দিলুম, আমার কথার উপর বিশ্বাস কোরে, কাজ ক'রে যাও, না হয় আমি তারপর আছি। ফাঁকি দিলে হ'বে না। আমরাই কি কম তপস্যা কোরেছি?"

২৮শে মাঘ বুধবার ১৩৪৩ সাল, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

সকাল বেলা স্বামিজী নীচে নামিলেন। উপরের ট্যাঙ্কে জল তুলিবার জন্য একটী ইলেট্রিক পাম্প আনা হইয়াছে। অদ্য প্রথম চালান হইতেছে; উহা দাড়াইয়া দেখিতেছেন। বলিলেন—"বেশ হ'য়েছে।" কি রান্না হইতেছে দেখিলেন। তারপর নীচের আফিস ঘরে গেলেন।

রাত্রিতে উত্তরাখণ্ডের বিষয় আলোচনা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"সাধুদের মাধুকরী কোরে খাওয়াই ভাল। ছত্রে তো ধনীর বাসনা কামনা জড়িত খাবার। ওতে সাধুদের তপস্যার হানি হয়। মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, এদের হয়ত কেউ মারা গেল; তার অনেক টাকা আছে, সেই টাকার কিছু ছত্রের জন্যে দিয়ে দেয়। কেউ হয়ত অনেক লাভ কোরেছে, সে কিছু টাকা ছত্রে দিলে। ছত্রে না খেয়ে মাধুকরী কোরে খাবি। ভিক্ষার অন্ন পবিত্র। আমরাও ঠাকুরের আদেশে ভিক্ষা কোরেছি। স্বামিজী, আমি, শরৎমহারাজ আর দু-একজন প্রথমে যাই; পরে রাজামহারাজ, শশীমহারাজ আর আর কে কে গেছল। তাতে ঠাকুর খুব খুসী হ'য়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ ভিক্ষার চাল রান্না কোরে ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। ঠাকুর খেয়ে বোলেছিলেন—"এতদিন পর আজ শুদ্ধ অন্ন খেলুম।"

৩০শে মাঘ শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"কাশীপুর বাগান বাড়ীতে ঠাকুরের কত লীলাই দেখেছি। তখন আমরা তাঁর সেবার জন্যে ওখানেই সর্বদা থাকতুম্। আমি কতদিন তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছি। শশীমহারাজ খুব সেবা কোরেছেন।" বিভিন্ন আলোচনার পর সন্ন্যাসের কথা উঠিল; বলিলেন—"সন্ন্যাস মোটামুটি চার প্রকার। যথা—বিবিদিষা সন্ন্যাস, বিদ্বৎ সন্ন্যাস, আতুর সন্ন্যাস, ক্রম সন্ন্যাস। যাঁরা সর্বত্যাগী হ'য়ে তপস্যাদি দ্বারা সন্ন্যাস অবস্থায় পৌঁছুতে চেষ্টা ক'রে,

তাঁরাই হ'ল বিবিদিষা সন্ন্যাসী। শুক, সনকাদির মত যাঁরা পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে ছেলেবেলা হ'তেই সংসার বিরাগী তাঁরাই হ'ল বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। যাঁরা মৃত্যু শয্যায় আচার্যের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র নেয়, তাঁরা হ'ল আতুর সন্ন্যাসী। আর যাঁরা সন্ন্যাস অবস্থা লাভ কোরে, তবে সন্ন্যাস নেয় বা সন্ন্যাসী হয় তাঁরা হ'ল ক্রম সন্ন্যাসী।"

—"প্রত্যেক যুগেই সন্ন্যাসের প্রবর্তক হ'য়েছেন। সত্যযুগে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি। দ্বাপরে—ব্যাস ও শুকদেব। কলিতে—গৌড়পাদ, গোবিন্দ, আচার্য শঙ্কর। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য প্রবর্তন কোরেছেন। বৈষ্ণবরা দশনামীর মধ্যে পড়েনা। চৈতন্যদেব কিন্তু দশনামী সন্ন্যাসীর (কেশব ভারতীর) নিকট সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

সন্ন্যাস মানে— সম্যকরূপে ন্যাস, ত্যাগ। এ আবার নেবে কি ? এহ'ল অবস্থা। সন্ন্যাস অবস্থা হ'ল পরমহংস অবস্থা। আবার কেহ কেহ আত্ম-সন্ন্যাস নেয়। এরূপ গুরু পরম্পরা চলে আসছে, আচার্যের নিকট নিতে হয়। সব মন্ত্রই তো প্রায় পুস্তকে আছে কিন্তু প্রেষ-মন্ত্র পুস্তকে পাবে না। এ মুখে মুখে চলে আসছে।

১লা ফাল্গুন শনিবার ১৩৪৩ সাল, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"ভজনাদিতে খুব রোক ক'রে লেগে থাকতে হয়। ঠাকুর বোলতেন—"এক জায়গায়ই কুয়ো খুঁড়তে হয়।" দৃঢ় নিশ্চয় কোরে পড়ে থাকতে হয়। সাধন-জগতে মণি-মুক্তা পড়ে আছে, একদিন খুঁজতে, খুঁজতে একটা পাবেই। নিরুৎসাহ হ'বে কেন ? ঠাকুর বোলতেন—"এ জন্মেই হ'বে এরূপ রোক করে লেগে যাও।"

—"সৎস্বরূপ যিনি, তাঁকে পেতে হ'লে সৎ হ'তে হ'বে। তুই সৎ কিনা নিজেই ভেবে দেখনা ? তোর কাম-কাঞ্চন, সুখ-দুঃখ, এসব কি ত্যাগ হ'য়েছে,

যে তাঁকে পাবি? তুই কয় দিন ভগবানের জন্যে কেঁদেছিস? তাঁর শরণাগত হ'য়ে থাকলে হ'য়ত একদিন দয়া কোরে দেখা দেবেন। তাঁর কৃপাই সম্বল।"

একটী গৃহস্থ-ভক্ত বসিয়া আছেন, তাঁহাকে বলিতেছেন—তোমায় তো বোলেছিলুম, সংযমী হ'য়ে থাকতে; তা তো তুমি পারলে না। তোমার কথা তুমিই খেলো কোরেছ। চার-পাঁচটী ছেলে-মেয়ে হ'য়েছে, আবার কি দরকার, এতেও ভোগ ক্ষয় হয়নি? ঐ তো তোমার স্বাস্থ্য। আর ছেলেদের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হ'য়েছে; যেন একটা সাপ, একটা ব্যাঙ, একটা কেঁচো। যত সব কামের কীট!"

২রা ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৩ সাল, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"বিশ্বাস, গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই, সাধু মহাত্মাদের কথায় বিশ্বাস কোরতে হয়। তাঁরা সত্য উপলব্ধি কোবে তবে বলেন। তাঁরা তো আর ব্যবসা কোরতে ব'সেননি? যা সত্যি তাই বলে গেছেন। ঠাকুর যা যা বলে গেছেন তাঁর কথা বিশ্বাস কোরে তপস্যা কর; তুইও তা বুঝতে পারবি; উপলব্ধি কোরতে পারবি। এইজন্যেই তো গুরুর দরকার। প্রমাণ কি? আমরাই তাঁর প্রমাণ। আমরা দেখেছি, বুঝেছি, প্রত্যক্ষ দেখেছি।"

—"ধর্ম তাহাই যার সাহায্যে মানুষ যথার্থ শান্তির অধিকারী হ'তে পারে। যাকে অবলম্বন কোরে মানুষ অমৃতের অধিকারী হয়। সমস্ত দুঃখ ও বাসনার নিবৃত্তি কর্তে হ'লে যে নীতি মেনে চল্‌তে হয় বা সাধন কোরতে হয় তাহাই ধর্ম।"

৩রা ফাল্গুন সোমবার ১৩৪৩ সাল, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"ভগবানে যে ভালবাসা তাই হ'ল প্রেম। তাঁকে পাওয়া ছাড়া ভক্তের আর কোন বাসনা নেই। তোদের ভালবাসা?—তো পেরেম। (হাস্য)

শুদ্ধা প্রেম মানে, যে প্রেম বা ভালবাসায় ভগবানকে পাওয়া যায়। মীরাবাঈ এ'র প্রেম হ'য়েছিল। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এ'র যে কোন একটীকে গ্রহণ কোরে ভগবানকে আপনার চেয়েও আপনার জেনে ভালবাসতে হয়।"

আজ সরস্বতী পূজা। কয়েকজনের দীক্ষা হইল। স্বামিজী প্রাতে নীচে আসিলেন এবং সরস্বতী দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তারপর ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন—"কিরে তুই সরস্বতীর কাছে কি চেয়েছিস? (আর একজনকে) তুই কি চেয়েছিস? তাঁর কাছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, চাইতে হয়। তাঁকে বল্ ব্রহ্মবিদ্যে দাও, পরাবিদ্যে দাও।"

দীক্ষার্থীদের বলিলেন—"আজ তোমরা দীক্ষা নিলে। জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী আজ পৃথিবীতে এসেছেন, তোমাদেরও আমি আশীর্বাদ কোরছি তোমাদের জ্ঞান হোক, বিবেক-বৈরাগ্য হোক। শ্রীশ্রীমাই হ'লেন সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী; আবার মুক্তিদাত্রী, মহামায়া।"

৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"এত কোরে যখন মানুষ জন্ম পেয়েছিস তখন কিছু একটা কোরে যা। চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরে মানুষ জন্ম পেয়েছিস। এবার সুযোগ সুবিধেও পেয়েছিস। কতজ'ন তো আসছে? তাদের সৎভাবের বিকাশই হয়নি। তোরা ঠাকুরের সন্তানদের আশ্রয় পেয়েছিস, তাঁর উদার মতে দীক্ষিত হ'য়েছিস। এতেও যদি তোদের চৈতন্য না হয়, তো কোন জন্মেই কিছু কোরতে পারবিনে।"

—"তোদের হ'বে না কেন? ঘস্‌তে ঘস্‌তে পাথরও ক্ষয়ে যায়। তা হ'লে হ'বে না, কে বল্লে? বল, যে আমরা খাটবো না। যত পাপই করনা, নিত্যি

নিত্যি জপ-ধ্যান কর, সব কেটে যাবে। আর গীতার উপর বিশ্বাস রেখে রোজ রোজ কিছু কিছু পড়বি.[১] আর তোর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবি। শাস্ত্র কি বোল্‌ছেন আর তুই কি মেনে চলছিস্‌। তুই তা কতটুকু পালন কোরে চলছিস, তা দেখবি তখন বুঝতে পারবি তোর গলদ কোথায়। এমনি গীতা পড়লে কি হ'বে? গীতা পড়ে যদি বিবেক-বৈরাগ্য নাই বাড়ল, তো গীতা পড়া মিথ্যে হ'য়ে গেল।"

প্রত্যেকের ভেতরেই জ্ঞান বর্তমান। তবে কারো প্রকাশ পায়, কারো তা প্রকাশ পায় না। সৎ সঙ্গে, সৎ চর্চায়, গুরু কৃপায় জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই জ্ঞানের সাহায্যে তুমি ভজনই কর, আর কর্মই কর যা কোরবে তাতেই শান্তি পাবে। পরার্থে কর্ম কর, তাতেই শান্তি পাবে। সর্বজীবের সেবা, পরোপকার কলিতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। তা তুমি স্কুলই কর আর ঔষধালয়ই কর। উদ্দেশ্য নিষ্কাম কর্ম করা। জপ ধ্যান অন্তে যেমন ভগবানকেই জপের ফল দিতে হয়, তেমনি কর্মের ফলাফলও ভগবানে অর্পণ কোরতে হয়। গরীবের দুঃখে যার হৃদয় কাঁদেনি, তার হৃদয়ের বিকাশও হয়নি। তুলসী দাস সাধু[২] বলেছিলেন—"ধনীর পায়ে যদি একটা কাঁটাও ফুটে তো সকলেই তাকে আদর করে, জিজ্ঞাসা করে, খোঁজ নেয়, দুঃখ করে,— এ দেখতে আসে, ও দেখতে আসে, আর একটী গরীব যদি পাহাড় থেকেও প'ড়ে যায়, তো তার খবর কেউ নেবে না। রাস্তায় পড়ে থাকলেও একবার জিজ্ঞাসা কোরবে না। যদি সে কোন সাহায্য চায়, তা পাবে না। সে দুঃখের কথা ব'ল্লেও কেউ তা শুনে না।"

---

১ গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

২ শ্রীমন্তকে কণ্টক ফুটে দরদ পুছে সব কোই।
দুখিয়া পাহাড় সে গীরে বাত না পুছে কোই। তুলসীদাস।

৫ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৪৩ সাল, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

গঙ্গাধর মহারাজের ভাই স্বামিজীকে তাঁহাদের বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। গঙ্গাধর মহারাজের স্মৃতিসভা হইবে। স্বামিজী ভোর সাড়ে-আটটায় সেখানে গেলেন। তাঁহাকে সভাপতি করা হইল। তিনি বক্তৃতা করিলেন। সমিতিতে আসিবার পর বলিতেছেন—"বল্লুম তাঁর খুব প্রীতির ভাব ছিল। গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর যেমন প্রীতি ছিল অমন প্রায় দেখা যায় না। শশীমহারাজ যেমন গুরুভাইদের জন্যে সব কোরেছেন, তেমন গঙ্গাধর মহারাজও খুব কোরেছে। সে স্বামিজীর খুব প্রিয় ছিল। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) যখন পরিব্রাজক ভাবে ঘুরতেন তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থাকতো—যদি স্বামিজীর কোন সাহায্যাদির দরকার হয়। দেখনা, স্বামিজী বিলেত থেকে তাঁকে চিঠি দিলে, তুমি গরীবদের জন্যে কিছু কর, তাই সে সারগাছি গ্রামে গিয়ে গরীবদের জন্যে আশ্রম কোরে সারাজীবন ওখানে পড়ে থাকল, আমার সঙ্গে তার খুব প্রীতি ছিল, মাঝে মাঝে পত্রাদি দিত। প্রেসিডেন্ট হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এসে ব'ল্লে—"ভাই এরা আমায় প্রেসিডেন্ট কোরেছে" ব'লেই আমায় জড়িয়ে ধরলে। বল্লে—"আমার (ওয়ারকিং) কমিটির কথামত ওঠা-বসা ভাল লাগে না।" ওর কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। তাই দেখনা মঠে থাকতে চাইত না।"

৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

মঠের একজন সন্ন্যাসী (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী) শ্রীশ্রীঠাকুরের শত বাৎসরিক সভার বিষয় বলিতেছেন—বিদেশ হইতে কে কে আসিবেন, কোন্ কোন্ দেশ হইতে প্রতিনিধি আসিবেন—এই সব। স্বামিজী বলিতেছেন—"তাঁর কাজ খুব কোরে যাও। তিনি তোমাকে দিয়ে এসব করিয়ে নিচ্ছেন।

যে তাঁর কাজ কোরবে সে কৃতার্থ হ’য়ে যাবে। এত অল্প দিনের মধ্যে তাঁর জগৎ-জোড়া কাজ দেখে আমি অবাক হ’য়েছি। এইতো সাধনা, ঐইতো তাঁর ভজন। তুমি যদি একটী লোককে শান্তির রাজ্যের পথ দেখিয়ে, তাকে সাহায্য কোরতে পার, তো তোমার জীবন ধন্য হ’য়ে যাবে। তুমি যে কাজ নিয়ে আছ তাতে নিশ্চয়ই তিনি সাহায্য কোরবেন। তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হ’তে পারবে।”

৭ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—“দীনতা ভাল, তা ব’লে ঐ যে বৃন্দাবনের কাক-বিষ্ঠার কৃমিকীট—এই ভাব আমি পছন্দ করিনে। ও হ’তে যাবে কেন, ভক্ত হও, সেবক হও। আবার সেবকাধম কেন? সেবকের মধ্যে উত্তম হ’তে পার না? সর্বদা অধম অধম বোলে সব কাজেই তোরা অধম হ’যে গেছিস। নীচ ভাব ভাল নয়। বীর ভাব চাই। চৈতন্যদেব যখন দেখলেন, সব অহঙ্কারে মেতে গেছে, সবাই মনে ক’বে আমিই সব তখন তিনি বল্লেন তৃণের মত নীচ হ’তে হ’বে[১]। এখন তোদের সব কাজেই, আমি পারিনে, আমার শক্তি নেই, আমি অযোগ্য, এই সব ভাব আসে। আরে, একমাত্র ভগবানের কাছেই নীচ হ’তে বোলছেন, আর সব জায়গাতেই বীরভাব থাকবে। আমি বীর, আমি সব কোরতে পারি, এই সাহস চাই। তা না হ’লে কোন কাজই কোরতে পারবে না। যে বীর সে সব সইতে পারে। সুখ দুঃখে এলিয়ে পড়া বীরের কাজ নয়।”

---

১ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—"তীর্থের মহিমা আছে বৈ কি ? তীর্থে গেলে ভগবানের স্মৃতি মনে হয়। সাধু মহাপুরুষদের সমাগমে তীর্থ পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়। সাধুদের সৎ চিন্তার দ্বারা সেখানে একটা সৎ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। ঐ আবহাওয়ায় তুমি যাও, তোমারও মনের ভাব পরিবর্তিত হ'বে। নির্জন স্থান আর তা যদি কোন তীর্থ হয়, তো দেখবে মন কেমন স্থির হয়। আমাদের এসব দেশের তীর্থ এখন জুয়াচোরের আড্ডা হ'য়েছে। হিমালয়ের তীর্থ এখনও বেশ পবিত্র আছে। ঠাকুর, শ্রীমা, অনেক তীর্থ দর্শন কোরতে গেছলেন। তীর্থে গিয়ে ভজনাদি কোরতে হয়; তবে ফল হয়, নতুবা মা বোলতেন—"তীর্থ ভ্রমণ মন উচাটন।"

৮ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৪৩ সাল, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

কয়েকজন গৃহস্থ ভক্ত বসিয়া আছেন। তাহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"তোমরা তো সবই বুঝতে পাচ্ছ ? তবুও ভোগ ছাড়তে পাচ্ছ না। তন, মন, ধন দিয়ে ভগবানের সেবা কোরতে হয়।, বুঝতে পেরেও তো কোরবে না ? একেই বলে মোহ। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই তো ভোগ কোরলে, তার পরিণামও দেখলে, এখনো তো নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসারে থাকতে পার ? তা না কোরলে ভুগতে হ'বে। জপ ধ্যান কর, প্রার্থনা কর, তবে জ্ঞান হ'বে। জ্ঞান কি এমনি আসবে ? পড়াশুনা কর, সৎসঙ্গ কর; তবে তো হ'বে।"

৯ই ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৩ সাল, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"কুম্ভক তো আপনিই হ'তে পারে। মন স্থির হ'লেই কুম্ভক হয়। প্রাণায়াম না কোরেও জপ, ধ্যান কোরতে কোরতে ধ্যান হয়, তখন শ্বাস স্থির হ'য়ে যায়; তখনই কুম্ভক হয়। এসব বায়ুর ক্রিয়া।"

—"প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চ বায়ু। আমাদের শরীরটাই সমস্ত বায়ুর দ্বারা চালিত। আত্মাই হ'ল পঞ্চবায়ুর প্রাণ। আত্মার শক্তিই এই পাঁচ প্রকার রূপ ধরেছে। যেমন—চক্ষু ও কর্ণে—প্রাণ বায়ু; লিঙ্গ ও গুহ্যস্থানে—অপান বায়ু; সমস্ত নাড়ীতে—ব্যান বায়ু; নাভিতে বা উদরে জঠরাগ্নিরূপে হ'ল—সমান বায়ু; সুষুম্নামধ্যে যে শক্তি ঊর্দ্ধে চালিত হয় তা হ'ল—উদান বায়ু। আবার স্থূলরূপে প্রাণ বায়ু, ত্রিলোক ব্যাপী। সাধারণ বাহ্য বায়ু হ'ল—ব্যান; তেজ শক্তিই—উদান। যোগীরা প্রাণবায়ুর সংযম দ্বারাই সমস্ত বায়ুর গতি স্থির করে। তখন সমস্ত বিকারই নাশ হ'য়ে যায়। এসব উপনিষদে পাবে।"

—"মানুষের তো পাঁচ অবস্থা বলা যায়। যথা :—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, অশরীরী। তুই জেগে আছিস, চলে বেড়াচ্ছিস এই তো জাগ্রত অবস্থা। আবার তুই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিস, এই হ'ল স্বপ্নাবস্থা, মনের স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার অবস্থা হ'ল সুষুপ্তি। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এ তিন অবস্থার অতীত যে অবস্থা তাই হ'ল তুরীয় অবস্থা। এই চারি অবস্থার অতীত যে অবস্থা তা হ'ল মহাকারণে স্থিতি বা পরব্রহ্মে অবস্থান। অশরীরী মানে শরীর যেখানে থাকে না। নিরাকার ব্রহ্ম, তার আবার শরীর কি?"

১০ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৪৩ সাল, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"কর্মই হ'ল মানুষের বন্ধন আর মুক্তির কারণ। কর্মই মানুষকে বন্ধন এনে দেয়। তুই সৎকর্ম কর, বন্ধন খসে যাবে; আবার তুই অসৎ কর্ম কর তোর ভোগ বাসনা বেড়ে যাবে। এই জন্যেই প্রবৃত্তি মার্গ আর নিবৃত্তি মার্গের ব্যবস্থা।"

—"যাতে বন্ধন এনে দেয় তাই অসৎ, আর যাতে বন্ধন কেটে দেয় তাই হ'ল সৎকর্ম। নিষ্কাম কর্ম; সৎকর্ম। জীবাত্মাই বন্ধনে জড়িয়ে

থাকে, কারণ জীবাত্মার হ'ল প্রবৃত্তি মার্গ। ঠাকুরের হাতে আঁকা দক্ষিণেশ্বরের দেওয়ালে এখনো দেখবে আছে—একটা গাছ তাতে আছে, উপরে একটা পাখী চুপ কোরে ব'সে, আর নীচুতে একটা পাখী, একবার এডালে একবার ওডালে ছুটছে, আর বিভিন্ন রকমের ফল খাচ্ছে। যে ফল খাচ্ছে, সে জীবাত্মা; আর যে ফল খাচ্ছে না, ছুটাছুটীও কোচ্ছে না, সে হ'ল পরমাত্মা। জীবাত্মারূপ পাখী কখনও টক্ ফল খাচ্ছে, তখন দুঃখ হ'চ্ছে, আবার মিষ্টি ফল খাচ্ছে, তখন সুখ হ'চ্ছে; পরমাত্মা কিন্তু কোনরূপ ফল খাচ্ছে না, এজন্যে সুখ দুঃখে তার কিছু কোরতে পারে না; নির্বিকার পরমাত্মা; সুখ দুঃখ ভোগ কোরবে না, সে তো সাক্ষীমাত্র। শাস্ত্রে তাই তাকে দ্রষ্টা বোল্‌ছে।"

—"আবার জীবাত্মা হ'ল পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব। যেমন আয়নাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব প'ড়ে মনে হ'চ্ছে, আয়নাটাই বুঝি সূর্যস্বরূপ কিন্তু তা নয়। আসল সূর্য আর প্রতিবিম্ব সূর্য আলাদা। পরমাত্মারূপ সূর্য আছে ব'লেই জীবাত্মারূপ প্রতিবিম্ব পড়ছে।"

—"বাসনাই হ'ল জীবের গতাগতির কারণ। নানারকম ভোগের বাসনা হ'চ্ছে, তাই ভোগের জন্যে আবার শরীরও ধরতে হ'চ্ছে। মনের সমস্ত বিকার তোর নষ্ট হ'লে তুইও নির্বিকার পরমাত্মাতে স্থির হ'য়ে থাকতে পারবি।"

১১ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"ত্রয়ী তো বেদের ছন্দ বিশেষ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব এই চার বেদের ছন্দ; পদ্য, গদ্য, গীত দ্বারা ভাগ করা হ'য়েছে। গায়ত্রীকেও ত্রয়ী বলা হয়। প্রাতঃগায়ত্রী, মধ্যাহ্নগায়ত্রী, সায়াহ্নগায়ত্রী এই তিনের সমষ্টি বোলেই একেও ত্রয়ী বলে। সমস্ত বেদ তো কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড

এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ড দ্বারা যাবতীয় ভোগ্য বস্তু ও স্বর্গাদি লাভ হয়। জ্ঞানমার্গেই—মুক্তি। উপনিষদ কয়েকটী কর্মকাণ্ডের, আর কয়েকটী জ্ঞানের বিষয় উপদেশ দেয়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এ সব তো কর্মকাণ্ড, আরণ্যক আর উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ড। বেদ অনাদি। কখন এর জন্ম হ'য়েছে কে বোল্‌বে? যখন মানুষের জ্ঞান হ'য়েছে তখনই বেদের সৃষ্টি। জ্ঞানই বেদ। এ সব জ্ঞানের কথা ঋষিদের মুখে মুখেই এতদিন চ'লে আসছিল। তারপর পুস্তকাকারে লেখা হ'য়েছে। কবে লেখা হ'য়েছে তা নিয়ে আবার বহু মতদ্বৈধ আছে। কার কথা শুন্‌বে? এসবের মীমাংসা হয় না। ঋষিবাক্যই গ্রহণীয।"

১২ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৪৩ সাল, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"বিষয়ীর বিষয়ে আনন্দ, তাই তারা সর্বদা তা নিয়ে আছে, তাতেই আনন্দ পাচ্ছে। ত্যাগীরা ত্যাগ ক'রেই আনন্দ পাচ্ছে, ভোগে তারা আনন্দ পায় না। তাই একমাত্র কৌপীন সম্বল কোরে সাধুরা কেমন আনন্দে থাকে। ব'লে—বেশ আছি, ব্রহ্মানন্দের মত কি সুখ আছে [১]? সে কয়জন বুঝতে চায়! সব তো ক্ষণিক সুখের জন্যেই ছুটছে। ছোট ছোট বিষয়, ভোগ-বাসনা এ সব ত্যাগ কোরতে না পারলে বিরাট যে সুখ, আনন্দ ওসব পাবে না। সে আনন্দ কি জানিস? অখণ্ড, অনন্ত, সর্বব্যাপী, অবিচ্ছেদ্য পূর্ণানন্দ [২]।"

—"নির্বিকল্প সমাধিতে যে আনন্দ তা মুখে বলা যায় না। সব বিষয়ের নিবৃত্তি ওখানে। যে খানেই বিষয়ের নিবৃত্তি সে খানেই আনন্দ। ওখানের

---

১ —এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহঃ উপঃ ৪।৩।৩২

২ ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখম্‌ অস্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌।

অবস্থা মুখে বলা যায় না। তথায় পরব্রহ্মের সঙ্গে একই ভাবে অবস্থান। ঠাকুর বোলতেন—"সেখানে আনন্দ-নিরানন্দের পার।" সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা। আনন্দ বুঝবে কে? সেখানে তো আর মন থাকে না? সমস্ত ইন্দ্রিয় মনে লয় হয়, মন আবার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আবার আত্মাতে লয় হয়, আত্মা আবার পরব্রহ্মে লয় হয়। আত্মা আর পরমাত্মা একই জিনিষ। জীবভাবে আত্মা, স্ব-স্বরূপে পরমাত্মা।"

১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"মানুষের মধ্যেই সব শক্তি সুপ্ত র'য়েছে। তোরাও মানুষ আবার স্বামিজীও (বিবেকানন্দ) মানুষ। তাঁতে আর তোতে প্রভেদ কি? কেবল শক্তি-বিকাশের তারতম্যই তফাৎ। তাঁর যে যে গুণ ছিল তুই তপস্যা দ্বারা লাভ কর, দেখবি তুইও স্বামিজীর তুল্য হ'বি। তিনি অখণ্ড ব্রহ্মচারী, সর্বত্যাগী। তিনি ছিলেন বুদ্ধের মত। তাঁর হৃদয় দেখ; গরীবের জন্যে কি না কোরেছেন। মিশনের এই যে সেবা বিভাগ এতো স্বামিজীই কোরে গেছেন। গরীবের দুঃখে পরের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ, বুদ্ধের পরেই স্বামিজী। স্বামিজীর মত বহুমুখী প্রতিভা জগতে বড় একটা দেখা যায় না।"

—"তোরা পারিস তো দেশের জন্যে গরীবের জন্যে কিছু কর না? সেবা কোরতে আমার তো খুব ইচ্ছে হয়। এক জায়গায় থেকে দল পাকাবার চাইতে দেশ-বিদেশে সমিতির কেন্দ্র কর। তাতে দেশেরও উপকার হ'বে, ঠাকুর স্বামিজীর ভাবধারাও সাধারণের মধ্যে প্রচার হ'বে। কাজে ফাঁকি দিয়ে মনে কোরছিস তপস্যা হ'বে? তা হ'বে না। এ যুগে, ঠাকুর যেভাবে চল্‌তে বলে গেছেন তাই আদর্শ কোরে চল্‌লে তবেই কল্যাণ। এ যুগে ঠাকুরের কাজই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। মনে কচ্ছিস এখান থেকে পালিয়ে গেলেই কিছু হ'বে, তা কি হয়? তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক।"

১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী কয়েকটী গৃহীভক্তকে বলিতেছেন—"তোমরা গৃহস্থ, তাঁর কাজে যতটা পার সাহায্য কোরবে। নিকটে আশ্রম থাক্‌লে সেখানে· যাবে। খুব শান্তভাবে ধীর স্থিরভাবে সংসারে থাক, আর নিয়ম কোরে সকাল সন্ধ্যায় জপ, ধ্যান ক'রে যাও। তিনি মনে শান্তি দেবেন। সংসারও কোরবে আবার ভজনাদিও কোরবে নতুবা সব গুলিয়ে যাবে; বিষয়ে লিপ্ত হ'য়ে পড়বে। 'কথামৃত' পড়বে। ঠাকুর যা ব'লে গেছেন সেগুলি মেনে চলতে চেষ্টা কর, আর কি বলব?"

—"আমাদের কৃপা পেয়েছ ভাবনা কি? এখন এ শরীর তাঁর হ'য়ে গেছে। তাঁর চিন্তা কোরে কোরে দেহ মন সব তাঁরই হ'য়ে গেছে।"

—"বিবেক, বৈরাগ্য চাই। রিপু সংযম চাই। মন-মুখ এক না হ'লে সাধন-ভজনে এগুতে পারবে না। শরীর, মন, বাক্যে পবিত্রতা চাই। কখনও অন্যের অনিষ্ট চিন্তা পর্যন্ত কোরবে না। মন শুদ্ধ হ'লে তাঁর কৃপা হ'বে। তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরবে—"আমায় ভক্তি দিন, বিশ্বাস দিন, শান্তি দিন; আমায় ইন্দ্রিয় সংযমের শক্তি দিন, সৎবুদ্ধি দিন। এই সব প্রার্থনা কোববে।"

—"ভগবানের দর্শন পেলে আর নাম-রূপ থাকবে না। আত্মার আবার নাম-রূপ কি? তিনি নাম-রূপের অতীত। আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। বিভিন্ন নদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন আর নদীব ভিন্ন ভিন্ন নাম বা রূপ থাকে না, সবই সমুদ্রে মিলে যায়। তেমনি জীব ব্রহ্ম সমুদ্রে মিশলে আর পৃথক সত্তা থাকে না।"

১৫ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৪৩ সাল, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"বেদান্তের মতে আত্মাই সব। তোর ভিতর যে আত্মা আছে, ব্রহ্মের সাথে তার কোন পার্থক্য নেই। আত্মাই ব্রহ্ম, এ বোধ হওয়া

চাই। ব্রহ্মের সাথে আত্মার অভেদ জ্ঞান হওয়া চাই। এই একত্বভাব দ্বারা অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যারা এইভাবে আত্ম-দর্শন ক'রে, তাদের আর শরীর ধারণ কোরতে হয় না। সে তো ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মস্বরূপই হ'য়ে গেল। তখন তার কাছে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ভেদাভেদ সব সমান হ'য়ে যায়। সমস্তই ব্রহ্মময় হয়। একেই বোলে—ব্রহ্মজ্ঞান।"

—"ঠাকুর বোলতেন—"জলের ভেতর যদি একটা কল্‌সী ডুবিয়ে রাখ, তো কি হয়? তার ভেতরেও জল বাহিরেও জল, সব জলময়—কিন্তু আকার থাকে।" তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানীরও শরীর প্রারব্ধবশে চলে; সে সমস্তই ব্রহ্মময় দর্শন ক'রে।"

কয়েকজন ভক্ত স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বসিলেন, অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। তাঁহারা বলিলেন—ঠাকুরই সব।

স্বামিজী—"হ্যাঁ, আবাব কৃষ্ণই সব। (হাস্য) তিনি সব হ'য়েছেন। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব সবই এক শক্তি। তেমনি কালী, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া এরাও এক শক্তি। বিভিন্ন নামরূপ—মূলে তিনি এক। দশমহাবিদ্যা? কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, ভৈরবী, বগলা, ধুমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা, ছিন্নমস্তা। আবার শিবও দেখ কত—যথা:—মহাকাল, অক্ষোভ্য, ত্র্যম্বক, পঞ্চবক্ত্র, দক্ষিণামূর্তি, একমুখ মহারুদ্র, মাতঙ্গ, সদাশিব, কবন্ধ আরও কত শিবের নাম আছে। এঁদের মধ্যে আবার তিনজনকে প্রধান বলা হয। দেবীর মধ্যে—মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী আর দেবতাদের মধ্যে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।"

১৬ই ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৩ সাল, ২৮শে ফেব্রুযারী ১৯৩৭

স্বামিজী—"অনুকূল সঙ্গ বেছে নিতে হয়। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। যাঁদের সঙ্গে থাকলে তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি দিন দিন বেড়ে

যাবে, এমন সঙ্গ কোরবে। যেমন লোকের সঙ্গে তুমি থাকবে, তোমার মনেও তেমন ভাবের ছাপ পড়বে। যদি তেমন সঙ্গ না পাও তো দু'চারজন মিলে একত্র হ'য়ে ঠাকুর স্বামিজীর পুস্তকাদি পাঠ কোরবে। তোমরাই তখন একটা সঙ্গ হ'য়ে দাড়াবে। তোমাদের সঙ্গে আবার দু'চারজন মিলে-মিশে তোমাদের সাথী হ'যে, তারাও ভাল হ'তে থাকবে। তবে অন্যকে ভাল কোরতে গিয়ে আবার যেন নিজেই খাবাপ হ'যে যেয়ো না। অসতের শক্তি বেশী। দেখনা, নীচু পথে কাউকে ধাক্কা দিলে সে গড়াতে গড়াতে অনেক দূর চলে যায়, কিন্তু উপরেব দিকে কাউকে ধাক্কা দাও, একটু এগিযে গিয়েই থেমে যাবে।"

—"মানুষের অসৎ সংস্কাব প্রবল বলে—অসৎদিকে আকর্ষণ। আবার কারো যদি সৎ সংস্কার প্রবল হয তো তার সৎবিষয়ে স্বাভাবিক টান হয়। তার সৎপ্রবৃত্তি সৎবাসনা দিন দিনই বৃদ্ধি হয়।"

১৭ই ফাল্গুন সোমবাব ১৩৪৩ সাল, ১লা মার্চ ১৯৩৭

অদ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ধর্ম-মহাসভা আরম্ভ। স্বামিজী মহারাজ বিকেলবেলা সভায় গেলেন। ডক্টর স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতি হইলেন। তাঁহার শরীব অসুস্থ থাকায় কিছুক্ষণ থাকিবাব পর চলিয়া গেলে, স্বামিজী সভাপতি হইলেন; সভান্তে স্বামিজী বক্তৃতা করিলেন।

রাত্রিতে সমিতিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"বললুম্ একমাত্র ঠাকুরের সন্তানরূপে এবং বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতারূপে আমিই বর্ত্তমান আছি। দক্ষিণেশ্বরে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছিল, তার শেষ শিখাটি আমিই একমাত্র ধরে আছি।" ঠাকুরের সন্তান ভিন্ন তার কথা কে বোল্‌বে? যাবা তাঁকে কখনো দেখেনি, তাঁর হাতে শিক্ষা পায়নি, তারা আবার কি বলবে? আমরা সর্বদা তাঁর পদতলে ব'সে থেকে তাঁর কিছুই বুঝতে পারলুম না, এখনও মনে হ'চ্ছে তাঁর কথা। যেদিক দিয়েই ভাবি না কেন,

কোন দিক দিয়েই তাঁর সীমা পাওয়া যায় না। যতই ভাবছি ততই অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। তাঁর নামে কোত্থেকে সব লোক আসছে। কত দেশ বিদেশ থেকে প্রতিনিধি আসছে; তার মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিতও আছেন। ঠাকুরই তো বলতেন—"দেখলুম, কত ভক্ত আসছে, কেউ সাদা, কেউ কেউ আবার বেঁটে বেঁটে।" এর পর আরও কত আসবে। এইতো মাত্র একশত বৎসর হ'ল। আরও কত হাজার বৎসর চলবে—কে জানে? স্বামিজী (বিবেকানন্দ) বলতেন—"ঠাকুরের এক একটা কথা নিয়ে বেদ-বেদান্ত লেখা যায়।" তাঁর ভাব এখনো সব কার্যকরী হয়নি। এসব ভাব ধীরে ধীরে লোকে নেবে, বুঝবে।"

১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ২রা মার্চ ১৯৩৭

সকাল আটটা। কয়েকটী ভক্তের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিতেছেন —"সাকারও সত্যি, নিরাকারও সত্যি; কোনটাই মিথ্যে নয়। ঠাকুর কেমন বল্লেন—"সাকার যেন বরফ, আবার নিরাকার যেন জল।" জল জমেই বরফ, কোন তফাৎ আছে কি? আবার তিনি সাকার নিরাকারের পার। তিনিই সব হ'য়েছেন, এভাব ভাল। আমার ইষ্টই সব বিভিন্ন মূর্তি হ'য়েছেন। তিনি সব হ'তে পারেন। সব অবতার, এক শক্তিরই বিকাশ, বিভিন্ন শরীর মাত্র।"

বিকেল বেলা, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ধর্ম মহাসভায় স্বামিজী পূর্ব হইতেই সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন; তাই তথায় গেলেন এবং বক্তৃতাদি করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছেন—"এই বৃদ্ধ বয়সে আর পারিনে। কি আর করি বল, তাঁর কাজ তিনি যেটুকু করিয়ে নেবেন তা কোরতেই হ'বে। বক্তৃতা কোরতে এখন আর পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি—তবুও বল্লুম। —"বিবেকানন্দজী প্রথম ধর্মসভায় দাড়িয়ে তাঁর কথা বোলেছিলেন, তাঁর

কাজের সূচনা কোরেছিলেন, আর আমি তাঁর ভাবধারার শেষ অঙ্কটি দিয়ে অধ্যায় শেষ করলুম। এখন তোমরা তা কাজে পরিণত কর। আদর্শ তিনি দিয়ে গেছেন। জগৎ এ আদর্শে বহুদিন চল্‌তে পারবে। গৃহীর আদর্শ, সন্ন্যাসীর আদর্শ, যোগের আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, সব আদর্শই এখানে পাবে। এর ভেতর মিথ্যের লেশ পাবে না। এখানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব আছে।"

রাত্রি এগারটা। স্বামিজী চেয়ারে বসিয়া আছেন। যাইতেই বলিলেন—"কাল কেমন হ'ল? একটা বিদেশী মেয়ে কেমন সুন্দর বক্তৃতা ক'ল্লে। আমাদের দেশে হ'লে তাঁকে দাঁড়াতেই দিত না। মেয়েদের কি সাহস, কি উদ্যম। দেখলে আনন্দ হয়, ওরা স্বাধীন দেশের মেয়ে কিনা? কাউকে বড় একটা পরোয়া করে না। স্বামী যদি খারাপ ব্যবহার ক'রে তো তাকে ত্যাগ ক'রে নিজে স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম ক'রে বা পুনরায় বিবাহ করে থাকতে পারে। আর আমাদের দেশে মেয়েরা স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জন কর্তে গেলে, তার জাত যায়। এমন মেয়েও ওসব দেশে আছে চাকরি করে সংসারের সব খরচ চালায়। তাঁদের কারো মুখাপেক্ষিণী হ'তে হয় না।"

১৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৪৩ সাল, ৩রা মার্চ ১৯৩৭

রাত্রিতে একজন সাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিতেছেন—"তোদের উদ্যম নেই, উৎসাহ নেই অথচ সাধু হ'তে এসেছিস। কাজে উৎসাহ, উদ্যম না থাকলে কেউ কোন দিন সৎকাজ কোরতে পারে না। তোদের তমোগুণী ভাব। সৎকাজ কোরতে হ'লে একটা রোক চাই, তা হ'লে কৃতকার্য হ'তে পারা যায়; নতুবা হ'বে না, পারবো না,—এরূপ ভাবের দ্বারা জগতের কোন কল্যাণপ্রদ কাজ হ'তে পারে না। নিজের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে এস। তুমি তাঁর কাজ কোচ্ছ, তিনি শক্তি দেবেনই। তিনি কাজ

করাচ্ছেন। এভাব না থাকলে শক্তি কি ক'রে পাবে? তুমি তো আর তোমার জন্যে কাজ কোচ্ছ না? পরের জন্যে, পরের উপকারের জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরবে, শক্তি চাইবে—তাতে দোষ নেই। যাতে নিষ্কাম ভাব থাকে, কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধি না আসে, প্রার্থনা কোরতে হয়। শরণাগত হ'য়ে কাজ কোরলে অহঙ্কার হয় না। ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস রেখে কাজে নেমে যাও, দেখবে তিনি শক্তি দেবেন, অর্থ দেবেন, সামর্থ্য দেবেন। আমাদের কি ছিল—না বিদ্যে, না বুদ্ধি, না বল্‌তে পারতুম, না লিখতে পারতুম। তাঁর নাম কোরে ওসব লাভ কোরেছি এবং বীরের মত কত দেশ ঘুরে এসেছি। তোমরা বিশ্বাস কর, দেখবে তোমরাও কত কাজ কোরতে পারবে। শুধু চরিত্র ঠিক রাখবে, নতুবা সব পণ্ড হ'বে। ব্রহ্মচারী হ'বে। সর্বদা নিজেকে ব্রহ্মচারী ভাব্‌বে। আমাদের দেখেও তোমরা শিখতে পাচ্ছ না?"

২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ৪ঠা মার্চ ১৯৩৭

স্বামিজী—"প্রথম প্রথম ধ্যানে কোন মূর্তিই আসে না। এরূপ হয়, তার কারণ সেই মূর্তির সম্বন্ধে তোর ধারণা নেই। অভ্যাস কর, এর পর দেখবি—ধীরে ধীরে ইষ্টমূর্তি মানস পটে আস্‌ছে। তারপর আরও অভ্যাস কর, তখন জ্যোতির্ময় মূর্তি আসবে। একাগ্রচিত্তে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করিস। প্রথমে অন্ধকার, তখন কোনরূপ মূর্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। চোখ বুজেই ধ্যান কোরবি। প্রথমে বেশ কোরে ইষ্টমূর্তির কোন ছবি দেখে, তারপর চোখ বুজে তা ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কোরবি। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করার নামই ধ্যান। ধ্যান যত গভীর হ'বে মূর্তিও তত পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাবি। এতে চিত্তবৃত্তি ও চঞ্চলতা কমে যাবে; মন স্থির হবে।"

—"নিজের জন্যে যে না ভাবে সেই পরের জন্যে ভাবতে পারে, পরের উপকারে নিজের কল্যাণ সাধন কোরতে পারে। নিজের স্বার্থ, নিজের খাওয়া-

পরা, সুখ-সুবিধে—এসব যার ভাবনা আছে, সে শরীর মন সম্পূর্ণভাবে পরার্থে উৎসর্গ কোরতে পারবে কেন? পরের জন্যে নিজের সব ত্যাগ কোরতে হ'বে, তবে সেবক হ'তে পারবি। সেবা কোরতে হ'লে আগে সেবার উদ্দেশ্য ঠিক করা দরকার। জ্ঞান লাভ কোরতে হ'বে, বিবেক-বৈরাগ্য সাথে রেখে তবে সেবা কোরতে হ'বে। জ্ঞানহীন সেবায় বন্ধন বা প্রচ্ছন্ন স্বার্থ এসে যায়। সত্যাশ্রয়ে জীবে প্রেম কোরতে হ'বে। প্রচ্ছন্ন ভোগ বাসনাই যদি এসে যায় তা হ'লে তখন পরার্থে না হ'য়ে নিজার্থে সব কিছু কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। এতে আত্মোন্নতি হয় না। উদারভাবে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না রেখে সেবা কোরতে পারিস তো আত্মজ্ঞান হ'বে।"

২১শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ৫ই মার্চ ১৯৩৭

স্বামিজী—"উপনিষদ বল্‌ছে—যদি এশরীরেই কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কোরতে পারে তবে সেই মুক্ত হ'তে পারে, নতুবা পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না, তাই আবার পৃথিবীতে শরীর ধারণ কোরতে হয়। ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্যে এস্থানই উপযুক্ত। তাই আত্মজ্ঞান লাভ কোরবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতে হয়।"

—"ভগবান লাভ কোরতে পারলে ব্রহ্মকেই পাওয়া হ'ল। তাঁকেই লাভ কর। তখন তিনি কে, তিনি কি, এসব তিনিই বুঝিয়ে দেবেন। ঠাকুর বলতেন—"তোমরা সে পাড়াতেই গেলে না? তা বুঝবে কি?" ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের শক্তি অভেদ।"

—"রাজামহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) সাকারবাদীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি হ'লেন সাকারবাদীর আদর্শ। আর স্বামিজী (বিবেকানন্দ) হ'লেন সাকার নিরাকার দুইই। আবার এ দু'এর পারে। আমি হলুম—নিরাকারী। (হাস্য) ঠাকুর ছিলেন সব ভাবের মূর্ত-প্রতীক। তিনি সাকার, নিরাকার, দ্বৈত, অদ্বৈত,

দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত,—আবার নামরূপাতীত ; ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি কি, তিনিই জানেন।”

২২শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৪৩ সাল, ৬ই মার্চ ১৯৩৭

কয়েকজন গৃহস্থ ভক্ত সন্ধ্যা-আরতির পব স্বামিজীব নিকট বসিয়া আছেন। সমাজের সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতেছে।

স্বামিজী—“তোমাদের আবার সমাজ কি? কতগুলি স্ত্রী-আচার মেনে চলেছ; লোকাচার, দেশাচার—এই সব। শাস্ত্র মেনে কযজন চল্‌ছে? এত দলাদলি আর কোথাও দেখবে না। পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ কোরতে হ’বে, আর চরিত্র তৈরী কোরতে হ’বে। তাহ’লে সমাজেব গলদ শুধরাবে। যে নেতা তারই চবিত্র খারাপ। সমাজের যিনি নেতা তার হয়ত দেখবে সাধারণ একজনের চাইতে চরিত্র খারাপ, অথচ সেই হ’ল সমাজেব নেতা, কারণ তার হযত বিদ্যে বা ঐশ্বর্য বেশী, কাজেই তাব কথাই হ’ল বেদবাক্য। (হাস্য)”

—“সাধারণ প্রতিষ্ঠানে বা কোন জনহিতকব প্রতিষ্ঠানে যদি ত্যাগী, সত্যবাদী, চরিত্রবান লোক নিযুক্ত না হয তো সেখানেব কর্মী সমাজকে কোন কালেই উন্নত কোবতে পারবে না। নিঃস্বার্থ কর্মী চাই। ত্যাগী মানে সন্ন্যাসী নয়। যে সমাজের জন্যে, জাতির জন্যে নিজেব স্বার্থ ত্যাগ কোরতে পারে সেই ত্যাগী। গ্রামে গ্রামে এখন সব কর্মী দরকার, যাবা সমাজের দোষ ত্রুটি, কুসংস্কার দূর কোরবার চেষ্টা কোরবে, আব পবার্থে জীবন উৎসর্গ কোরবে। এই জন্যেই স্বামিজী এত কোরে চেষ্টা কোরে গেছেন, যাতে কর্মী তৈরী হয়। তুমি যদি একজনের মধ্যেও সেবাব আদর্শ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ এনে দিতে পার তো তোমার জীবন ধন্য হ’য়ে যাবে। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগিয়ে দিতে হ’বে। সেই বোধ যাতে তাব হয়, তার জন্যে চেষ্টা

কোরতে হ'বে। নিজে পবিত্র থাক, তোমার দেখাদেখি আরও কতজন পবিত্র হ'বে। ঠাকুর বোলতেন্—'যে নিজে মুক্ত হ'তে চেষ্টা করে, সেই যথার্থ প্রচার করে'।"

২৩শে ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৩ সাল, ৭ই মার্চ ১৯৩৭

স্বামিজী—"গীতার নিষ্কাম কর্মই হ'ল আদর্শ। গীতা যে কৌশলে কাজ কোরতে বলেছে সেই কৌশলে কাজ কোরলে আর বন্ধন-ভয় নেই। মানুষ যখন কর্মহীন হ'য়ে থাকতে পারে না, তখন তার উচিত শ্রীভগবানের নির্দেশমত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ কোরে অনাসক্ত হ'য়ে, রাগদ্বেষ হ'তে নিজেকে মুক্ত রেখে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান কোরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি স্ববশে রেখে কাজ কোরে যাওয়া। তা হ'লেই দেখবে দিন দিন বন্ধন কেটে যাবে। বিষয়াসক্তি কমে যাবে।—গীতা সমস্ত উপনিষদের সার সংগ্রহ [১]। এতে কর্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ সব পাবে। আত্মসংযম কোর্তে হ'বে। আত্ম-সংযম মানে শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদির সংযম। নিজের সৎবৃত্তিগুলির বিকাশ কোরতে হ'বে। তবে নীচ প্রবৃত্তি, পশুভাব দমন হ'বে।"

একটী গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া বসিলেন। জপ ধ্যান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"তোমার যদি গুরুমূর্তি ধ্যানে আসে তো তাই কর। গুরু ইষ্ট এক জ্ঞানে তাঁরই ধ্যান কর। ক্রমে ক্রমে গুরুকে ইষ্টমূর্তিতে চিন্তা দ্বারা বিলীন কোরে দেবে। তখন কেবল ইষ্টমূর্তিই বর্তমান থাক্‌বে। গুরু বা ইষ্টমূর্তি যাই ধ্যানে আসুক না কেন, তাতে দোষ নেই। একটাতে মন স্থির হ'লেই হ'ল। একে একে সব হ'বে, ধৈর্য ধরে পড়ে থাকা চাই। ভজনাদি একমাত্র ধৈর্যের সহায়েই সম্ভব হয়। আমি এ শরীরে থাকি আর

---

১ সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥—গীতাধ্যান॥

নাই থাকি তাতে কি? এইটুকু জানবে তোমাদের কল্যাণ সর্বদা কামনা কোরব।"

২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ৯ই মার্চ ১৯৩৭

সকাল দশটা হইবে। পূর্ববঙ্গ হইতে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। তাহার সহিত কথা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"দেখ কর্মই বন্ধন আর কর্মই মুক্তির কারণ। জ্ঞান নিয়ে বিচার কোরে কর্ম কর। অজ্ঞান জনিত কর্ম, বন্ধনের কারণ। জ্ঞানই তো কর্মের কৌশল শিখিয়ে দেবে? কর্ম না কোরে উপায় নেই। এখন তুমি পরের জন্যেই কর্ম কর আর নিজের জন্যেই কর্ম কর।"

—"তোমরা আশ্রমাদি কোরে ঠাকুরের কাজ কোচ্ছ, এ বেশ। তবে কি জান? এতে অনেক সময় আবার অহঙ্কার, মান, যশ এসব এসে পড়ে। এদের হাত হ'তে দূরে থাকবে। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) যেমন পরের জন্যে, পরের সেবার জন্যে কত কিছু কোরে গেছেন। তাঁর এক জীবনে আর কতই বা কোরবেন? আমিও তো বলি—যারা পরের উপকারের জন্যে নিজের সুখ-সুবিধে সব কিছু উৎসর্গ কোরতে পেরেছে তার কল্যাণ হ'বেই। শুধু জীবের কল্যাণেব জন্যে, পরের উপকারের জন্যে কাজ কোরে যাও—মুক্তি, স্বর্গ, নরক এসব ভেবে দেখবারও দরকার নেই। ভগবান এর জন্যে যা কোরবেন তাই হোক। ফলের দিকে চাইবে কেন? তা হ'লে তো তোমরা স্বার্থের জন্যেই কর্ম কোরলে! কোন প্রকার বাসনা থাকবে না।"

২৬শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৪৩ সাল, ১০ই মার্চ ১৯৩৭

সকাল নয়-দশটার সময় বেলুড়মঠ হইতে বোষ্টনের স্বামী পরমানন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজগণ স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

মঠের কাজ কিরূপ চলিতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন—"হ্যাঁ, তোমরাই তো স্বামিজীর অপূর্ণ কাজ পূর্ণ কোরবে। তিনি তোমাদের কত ভালবাসতেন। আমরা তো এখন অথর্ব হ'য়ে ব'সে আছি। আমাদের এখন যাবার পালা, কি বল?" (হাস্য)

—"ঠাকুরের অদ্ভুত কাজ! আরও কত দেখবে।" অন্য কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"আমার যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন হ'ল তখন দেখলুম ঠাকুর একটা উঁচু বেদীতে ব'সে আছেন আর আর অবতারগণ ভিন্ন ভিন্ন বেদীতে ব'সে আছেন। বিভিন্ন অবতারগণ একে একে এসে ঠাকুরের শরীরে মিশে যাচ্ছেন। তাই তো তাঁকে 'অবতার বরিষ্ঠায়' বলা হয়।

এ বেশ পরিষ্কারভাবে দর্শন কোরলুম, কোন অবতার কিছু বোলছেন না, সব একে একে এসে তাঁতে মিশে যাচ্ছে। এ ধ্যানে দেখেছি স্বপ্নে নয়।"

কিছু সময় কথাবার্তার পর স্বামিজী তাঁহাদের সহিত নীচে আসিলেন এবং পুরাতন মন্দিরে ঠাকুরের তৈল-চিত্র দেখাইলেন। সঙ্গে জি, পালও ছিলেন। তাঁহার সহিতও কথা হইল। স্বামিজী বলিলেন—"তোমরা এমন চিত্র আঁকতে পার? এসব দেশে অমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারবে না। (ফ্র্যাঙ্ক-ডোরাক কর্তৃক অঙ্কিত) মায়ের ছবি আরও সুন্দর হ'য়েছে।" তাঁহাদিগকে নূতন মন্দির দেখাইয়া বলিলেন—"ঠাকুরের মন্দির হ'ল। এখন তাঁর তিথিতেই প্রতিষ্ঠা কোরবো।"

২৭শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ১১ই মার্চ ১৯৩৭

গৃহস্থ ভক্তদের প্রতি স্বামিজী বলিতেছেন—"তোমরা সব ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কোরবে। তিনি সকলের প্রার্থনাই শুনেন। প্রার্থনায় অজ্ঞাত ভাবে মনের সমস্ত পাপ-তাপ নষ্ট হ'য়ে যায়। আন্তরিকতার সহিত তোমার সমস্ত

মনের বেদনা তাঁকে জানাবে। প্রার্থনার মত, শরণাগতির মত, সহজ উপায় আর নেই। সংসারের যত সব ঝঞ্ঝাট তাঁর কাছেই জানাবে। তিনি ইচ্ছে কোরলে তোমার ভজনাদির সব সুবিধা কোরে দিতে পারেন। যতদুর পার জপ ধ্যান কোরে যাও, আর প্রার্থনাদি কোরে যাও; তিনি নিশ্চয়ই মনে শাস্তি দেবেন। তিনি যখন তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে এসেছেন তখন একদিন আগেই হোক আর একদিন পরেই হোক তোমাদের শাস্তি দেবেনই।"

২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ১২ই মার্চ ১৯৩৭

গতকল্য শিবরাত্রি গিয়াছে। শিবপূজার ফলমিষ্টি স্বামিজীকে দিতে যাইতেই তিনি বলিলেন—"কি গো? আমি জ্যান্ত শিব, তোমাদের সব ফলমিষ্টি খেয়ে ফেলতে পারি। (হাস্য) কই সিদ্ধি কৈ? সিদ্ধি না হ'লে কি শিবপূজো হয়?" তৎপর স্বামিজী একটা বেদানার অংশ গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"নাও! এসব তোমাদের জন্যে রইল। আমি যদি সব খেয়ে নেব তো আমার ভূত-প্রেতরা কি খাবে?" (হাস্য)

একটী ভক্ত স্বামিজীর জন্য মালা লইয়া আসিয়াছেন। মালাটী তাঁহার গলায় দিবার অনুমতি লইয়া ভক্ত মালাটী স্বামিজীব গলায় পরাইয়া দিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন—"তোমার শিবপূজোব ফল লাভ হোক।"

৩০শে ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৩ সাল, ১৪ই মার্চ ১৯৩৭

অদ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথি। সমিতিতে উৎসব। অদ্যই ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রাতে সাতটায় স্বামিজী নীচে আসিলেন এবং মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। নীচে কিছুক্ষণ থাকিয়া মন্দিরাদি দেখিলেন এবং পূজাদি সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া উপরে গেলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া

গেলে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় এগারটায় পুনরায় স্বামিজী নীচে আসিলেন। মন্দিরে আসন করিয়া দেওয়া হইল। মন্দিরে গম্ভীরভাবে স্বামিজী ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতেছে। কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহাকে ধরিয়া প্রদক্ষিণ করান হইল। মন্দিরে আসিয়া স্থিরভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের ছবি ধরিয়া রহিলেন, মন্ত্র বলিতে পারিলেন না। কিছু সময় পর—"ঠাকুর আমার বহু দিনের সঙ্কল্প—তুমি এখানে প্রতিষ্ঠিত হও।" বলিয়া ঠাকুরের ফটো সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন এবং মায়ের ছবিও ঐরূপ স্থাপন করিলেন। স্বামিজী আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে না পারায় তাঁহাকে ধরিয়া উপরে লইয়া যাওয়া হইল।

রাত্রিতে উপরে গেলে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিগো, উৎসবাদি কেমন হ'ল? ওবেলা আমি আর আমাকে সামলাতে পারলুম না। এসব স্থানে ঠাকুর কত যাতায়াত কোরেছেন। তা তাঁর মন্দির হ'ল; বেশ হ'ল। কলকাতায় আর ঠাকুরের মন্দির কই?"

১৫ই চৈত্র সোমবার ১৩৪৩ সাল, ২৯শে মার্চ ১৯৩৭

গতকল্য স্বামিজীর শ্রীরামপুরের আশ্রমে যাইবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নাই। অদ্য বিকালে গেলেন। সঙ্গে একজন সাধু ও একজন ব্রহ্মচারী গেলেন। রাত্রিতে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন, একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—"তুমি তো সব পেয়েছ। ভগবানের কাছে যা চেয়েছ তাই পেয়েছ। টাকা-কড়ি, ধন-জন, বিষয় সম্পত্তি সব চেয়েছিলে; সব পেয়েছ; তাঁকে চাওনি তাই পাওনি। (হাস্য) আন্তরিকভাবে ভগবানকে চাইলে পেতেও;—তাঁকে কি চেয়েছিলে? বিষয়-সম্পত্তির জন্যে কত খেটেছ। তাঁর জন্যে কতটুকু চেষ্টা কোরেছ? টাকা পয়সার জন্যে

কত খেটেছ; ভগবানের জন্যে রোজ রোজ দু'ঘণ্টা কোরে খাট দেখি? তাঁর কৃপা বুঝতে পারবে। এম্‌নি কি কিছু হয়? আমাদেরই দেখনা কত সাধন ভজন কোরতে হ'য়েছে? ঠাকুরের সন্তানরা প্রত্যেকে কঠোর সাধনা কোরেছেন। তবে সিদ্ধ হ'য়েছেন এবং লোকশিক্ষা দিয়েছেন। তোমাদের আন্তরিকতা কই? আন্তরিকতার সহিত তাঁকে ডেকে যাও, সব হবে।"

১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ৩০শে মার্চ ১৯৩৭

কয়েকটী স্ত্রীভক্ত দীক্ষার জন্য প্রাতে দশটার সময় আসিয়াছেন। তাঁহাদের কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"দীক্ষা আর কিছুই নয়; তাঁর নাম নেওয়া ও জপ করা এই সব। তাঁর শরণাগত হও। কোন বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখবেন না। আর প্রার্থনা কোরবে যেন আর জন্মাতে না হয়। শরীর ধারণ কোরতে না হয়। ঠাকুরের নাম, তারকব্রহ্ম নাম। যে নেবে সে পবিত্র, মুক্ত হ'য়ে যাবে। তাঁর নামের অদ্ভুত মহিমা। তুমিতো বাল-বিধবা, তোমার আর কি বন্ধন? পবিত্র ভাবে থাকবে আর ভগবানের নাম কোরবে।"

স্বামিজী নীচে আসিলেন। ঠাকুরঘরে দীক্ষাদি হইল। দীক্ষিতদের প্রসাদ লইবার জন্য বলিয়া গেলেন। দীক্ষান্তে তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যা ইচ্ছে আমার কাছে প্রার্থনা কর।" তারপর স্বামিজী বলিলেন—"আমি আশীর্বাদ কোরছি তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস হোক।"

রাত্রিতে স্বামিজীর ঘরে খুব ভীড় হইয়াছে। ভক্তরা বসিয়া আছেন। নানা আলোচনা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"সংসারের সুখ-দুঃখ তো থাকবেই। এরই মধ্যে সময় কোরে সাধন ভজন কোরতে হ'বে। সুযোগ হ'বে তবে তাঁকে ডাকবে, তা-আর ডাকা হ'বে না। আর যদি তা কোরতে না পার তো পরার্থে কিছু কাজ কর। পরের জন্যে করা মানে নিজের জন্যে

করা। তাতে নিজেরই কল্যাণ হয়। গরীবের জন্যে, পতিতের জন্যে যদি কিছু কোরতে পার, সে উত্তম। সকলেই ভজন সাধন কোরতে পারে? কেউ নিষ্কাম কর্ম করে, আবার কেউ সকাম।"

—"আমরা আর কি কোরেছি? তিনি যতটুকু করিয়ে নিয়েছেন ততটুকু বৈ-ত নয়? আমি আর তোমাদের কি বোলতে পারি, আর ব'লেই বা তোমরা শুনবে কেন? স্বামিজী তো কত সভা সমিতি, কত ক্লাস কোরলেন। তাঁর কতটুকু ভাবধারা লোকে নিয়েছে?—তবে নেবে বৈকি। এখনো কত শত বৎসর লাগবে তাঁর চিন্তাধারা কাজে লাগাতে তা কে বোল্‌বে। ঠাকুর স্বামিজীর কথা মিথ্যে হ'বার যো নেই। তাঁরা সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ। আর ঠাকুর হ'লেন কপাল মোচন।"

১৭ই চৈত্র বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৩১শে মার্চ ১৯৩৭

সন্ধ্যা আটটা হইবে। নলিনী সরকার ষ্ট্রীটের ক—নাম্নী একটী স্ত্রীভক্ত স্বামিজীর সহিত প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করিতেছেন। স্বামিজী বলিতেছেন— "ভক্তি মানে—তাকে আন্তরিক ভাবে ভালবাসা। নিষ্ঠার সহিত ভগবানের সেবার নামই ভক্তি। আর জ্ঞান মানে—সদ্ অসৎ বিবেক। কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ—এই বোধ। ভগবানই সৎ, আর সব অসৎ। ঠাকুর বোলতেন—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' যা কিছু নষ্ট হ'য়ে যায়, তাই মিথ্যা, আর যার বিনাশ নেই তাই নিত্য। ভগবানের কি বিনাশ আছে? তাই তিনি সব কালেই আছেন। তিনি অনাদি; সৃষ্টিও নেই, বিনাশও নেই।

—তাঁকে বুঝতে হ'লে সাধন দরকার। সাধন ভজন না কোরলে তাঁর কৃপা বুঝতে পারবে না। তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। সাধু মহাপুরুষদের কাছে তিনি আছেন আর নাস্তিকদের কাছে তিনি নেই? মানে—নাস্তিকরা

ভগবানকে বিশ্বেস করে না। আয়নাতে তোমার মুখ দেখ, প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। আবার আয়নাতে যদি ময়লা থাকে তো কিছুই দেখতে পাবে না। সেরূপ ভক্তেব হৃদয়ে তিনি আছেন ভক্ত তা দেখতে পায়। ভক্তের কোন মলিনতা নেই। কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কোরতে হয়। তখন মনের ময়লা কেটে যায়, অন্তর শুদ্ধ হয়।

—সংসারের কাজকর্ম সেরে যতটা পার জপ-ধ্যান কোরবে। সকাল সন্ধ্যে খুব সময় হয়। ইচ্ছে থাকলে উপায়ও হ'য়ে যায়, সংসারেই কত মেয়ে আছে যারা খুব জপ-ধ্যান করে। আমি জানি, তারা রাত্রিতে উঠে ভগবানকে ডাকছে। তারা পারে আর তুমি পারবে না? খুব পারবে।"

১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ১লা এপ্রিল ১৯৩৭

স্বামিজীব ঘরে কযেকটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। প্রাতে, নয়টা হইবে। তাঁহাদের সহিত আলোচনা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্মের দ্বারা হ'যেছে। কর্ম দ্বারাই বিচার হয়। ব্রাহ্মণ যদি তার কাজ না করে, তো সে ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের আচার-নিতি মেনে চলে, ব্রাহ্মণের কর্ম, জপ-ধ্যান তপস্যা করে তো সে ব্রাহ্মণের অধিকার পেতে পারে। স্ব স্ব বৃত্তি কখনো ত্যাগ কোরতে নেই। সাধুর বৃত্তি আছে তাই সাধু। চণ্ডালের কর্মের দ্বারাই সে চণ্ডাল। সে যদি সাধুর বৃত্তি গ্রহণ করে তো সে সাধু, কি বল গো?"

১৯শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৪৩ সাল, ২রা এপ্রিল ১৯৩৭

ঘরে কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। তাহারা সকলেই কিছু কিছু প্রশ্ন স্বামিজীকে করিতেছেন? স্বামিজী বলিতেছেন—"যতদিন না চিত্তশুদ্ধ হয় ততদিন তোমার ধারণা কোরবার

সামর্থ্য হ'বে না। এজন্যে সাধুসঙ্গ কোরে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন কোরে নিজকে তৈরী কোরে নিতে হয়। নতুবা আমি বল্‌লেও তুমি বুঝতে পারবে না, পর মুহূর্তেই ভুলে যাবে। অনুর্বরা জমিতে কি বীজ ফেললে গাছ হয়? সাংখ্য পড়নি? [১] তাহাতে বেশ আছে। উর্বর জমি আর উত্তম বীজ তবে গাছ ভাল হয়, ফলও ভাল হয়। একটা ভাল হ'লে কি হ'বে? সব অনুকূল হওয়া দরকার। যেমনি গুরু তেমনি শিষ্যও অধিকারী হওয়া চাই। উপদেশের মূল অনুসন্ধান কোরতে হয়, বুঝবার চেষ্টা কোরতে হয়।

সমাজের কথা আরম্ভ হইল। স্বামিজী বলিতেছেন—"হিন্দু সমাজ বড় নিয়ম কানুন দিয়ে বাঁধা। আগেকার সমাজ কিন্তু অনেক উদার ছিল। ব্রাহ্মণদের হাতেই সমাজের সব কর্তৃত্ব ছিল। তাদেরও তেমনি ক্ষমা, দয়া, সুবিচার ছিল। এখন তেমন ব্রাহ্মণও নেই আব কর্তত্বও নেই। তারপর এলেন 'মনু'। এখন তো দেখতেই পাচ্ছ, মনুও নেই; এখন নিজ নিজ রুচি নিয়ে কথা। আবার সব শৃঙ্খলায আসবে, তার সূচনাও হ'য়েছে। রামায়ণই ব'ল আব মহাভারতই ব'ল, কে তা মানছে? শাস্ত্র মেনে কয়জন চলছে? সব দিক দিয়েই জাতির পতন হ'য়েছে। স্বামিজী (বিবেকানন্দ) বোলেছেন—"আবাব সত্য যুগের সূচনা হ'য়েছে।" আমবা সূচনা দেখেই গেলুম। তোমরা দেখ, তা দেখতে পাও কিনা।" (হাস্য)

২০শে চৈত্র শনিবার ১৩৪৩ সাল, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৭

রাত্রি সাতটা হইবে। একজন ব্রহ্মচাবী আসিয়াছেন। তিনি পূর্ব বঙ্গের কোন আশ্রমে থাকেন। স্বামিজীকে কিছু উপদেশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। স্বামিজী বলিলেন—"উপদেশ ক'রে কি হ'বে? কত

---

১ ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥৪।২৯। সাংখ্য।

উপদেশ কোরেছি, তাতে কিছুই বুঝতে পারনি? বই-টই পড়, তাতেই কত উপদেশ আছে। একজনকে বল্লেই অনেককে বলা হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ কোরলেন, তা একজন পাপী লোক শুনে তারও জ্ঞান হ'য়ে গেল। শত শত লোক এখানে আসবে, আর সকলকে উপদেশ কোরতে হ'বে নাকি?" (হাস্য)। আবত্তির পর আরও কয়েকজন ভক্ত স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াই স্বামিজী বলিলেন—"তোমরাও কি উপদেশ শুনতে এসেছ নাকি? (হাস্য)। উপদেশ কোরবো কি? আমাদের জীবন দেখে শিখবে, আমাদের চরিত্র দেখ না! তার অনুকরণ কর। কথায় কি হ'বে?"

২১শে চৈত্র রবিবার ১৩৪৩ সাল, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৭

সকাল এগারটার সময় স্বামিজী কয়েকজন ভক্তসহ অফিস ঘরে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থ শরীরের বিষয় আলোচনা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"তাঁর অত বলিষ্ঠ দেহ, এত কঠোর তপস্যা কোরেছেন; তাতেও এত রোগা হ'য়ে পড়েন নি। কিন্তু অসুখে তাঁর শরীর একদম ভেঙ্গে গেছ্‌ল। নির্বিকার ভাবে সব সয়ে গেছেন? কখনো যন্ত্রণার ভাব পর্যন্ত দেখিনি। মন আর শরীর আলাদা, দুটি পৃথক জিনিষ। সাধারণের কিন্তু তা নয়, মন খারাপ হ'লেই শরীর ভেঙ্গে পড়বে। আবার শরীর খারাপ হ'লে মনও ভেঙ্গে যায়, দুর্বল হ'য়ে পড়ে।" কাশীপুর শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে শেষ ফটো তোলা হইয়াছিল তাহার বিষয় বলিতেছেন—"অবতার মহাপুরুষদের বিনাশ নেই, তাঁহাদের বার্দ্ধক্য নেই এই জন্যে তাঁহাদের শেষ বয়সের ফটো রাখতে নেই। ভগবানের আবার হ্রাস বৃদ্ধি কি? তিনি তো নিত্যই আছেন? শ্রীকৃষ্ণের বার্দ্ধক্যের ফটো দেখেছিস? অথচ তিনি তো বহুকাল বেঁচে ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বার্দ্ধক্যের ফটো অনেক আছে। আমি তো বারণ কোরেছি, তা ছাপাতে পারবে না। অবতারের বার্দ্ধক্য দেখাতে নেই। তিনি পূর্ণ। 'ফ্রেঙ্ক ডোরাক' কেমন তৈলচিত্র এঁকেছে। মায়ের ফটো খুব ভাল হ'য়েছে। অমনটী আর এদেশে আঁকতে পারবে না। ঠিক ষোড়শী মূর্তি। যেন জ্যোতির্ময়ী হ'য়ে ব'সে আছেন। মা আমাদের নিজের ছেলের মতই দেখতেন। গুরুভাইরা এক একজন শরীর ছাড়তেন তা কেঁদে আকুল হ'য়েছেন। শোকে দু-তিন দিন কিছু খেতে পর্যন্ত পারতেন না। স্বামিজীর শরীর গেল, মা কাঁদতেন আর সকলের কাছে বোলতেন—"নরেন খেটে খেটে মরে গেল।" ঠাকুর আর কি শোক-তাপ পেয়েছেন ? মাকে অনেক সইতে হ'যেছে।"

২৩শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৪৩ সাল, ৬ই এপ্রিল ১৯৩৭

প্রাতে স্বামিজী এখনো অফিস ঘরে আসেন নাই। শয়ন ঘরে কি যেন করিতেছেন, আর গান করিতেছেন—"হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।" কিছুক্ষণ পর আফিস ঘরে আসিলেন। ব্রহ্মচারী নি— চৈতন্য মহারাজের পত্র দেখাইয়া বলিতেছেন—"সাধু হ'বে, আমায় লিখেছে। সাধু কি কেউ কোরতে পারে ? সাধু হ'তে হয়। সাধুর চরিত্র অনুকরণ কোরতে হয়। আর তেমনি ভাবে নিজকে তৈরী কোরতে হয়। শরীর খারাপ, মা র'য়েছে ; তো আমি কি কোরব। ঠাকুরকে বলুক, তিনি সময় হ'লে সব ব্যবস্থা কোরবেন।"

২৪শে চৈত্র বুধবার ১৩৪৩ সাল, ৭ই এপ্রিল ১৯৩৭

সন্ধ্যা আরতির পর। স্বামিজীর ঘরে অনেক ভক্ত আছেন। বলরাম দে ষ্ট্রীটের উ—বাবুর সহিত কথা হইতেছে। স্বামিজী বলিতেছেন—"মঠ (বেলুড়) ঠাকুর স্বামিজীর স্থান। মাঝে মাঝে যাবে। তাঁদের একান্ত

ইচ্ছেতেই মঠ হ'য়েছে। তাঁর সব সন্তানরা মঠের জন্যে শরীর-মন দিয়েছে। কালে ওটা তীর্থ হ'য়ে দাঁড়াবে, কি বল ?

আমি কামারপুকুর জয়রামবাটী গেছলুম। তখন হেঁটেই গিয়েছি, তোমরা একবার যাওনা। তাঁর জন্মভূমি দেখে এস। এখনো অনেকটা পবিত্র ভাব আছে। পাড়াগায়ের ভাব আছে। মঠ থেকে ওখানে মন্দির কোরবার কথা হ'চ্ছিল, হ'লে আর সে ভাব পাবে না। তখন রাজসিক।" (হাস্য)

বিভিন্ন প্রসঙ্গ হইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা উঠিল; স্বামিজী বলিতেছেন—"তিনি কোন ধাতু-দ্রব্যই স্পর্শ কোরতে পারতেন না; মাটির গ্লাসে ক'রে জল খেতেন। পায়খানায় যেতেন, তা অন্য একজন গাড়ু সঙ্গে নিয়ে যেত। আমি সমিতিতে ঠাকুরের সিংহাসন ধাতু দিয়ে কোরতে নিষেধ করেছি।"

২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৪৩ সাল, ৮ই এপ্রিল ১৯৩৭

রাত্রিতে, স্বামিজী বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। ঘরে তিন জন ভক্ত আছেন। স্বামিজী বলিতেছেন—"বিজ্ঞান মানুষের সমাজের সুখ-সুবিধে সব কোরেছে। জাগতিক-ব্যাপারে এব উন্নতি হ'য়ে মানুষের পরিশ্রম কমে গেছে। তিন মাসের পথ এক দিনে যাও। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা এর মধ্যে নেই। পরজন্ম-টন্ম এরা মানে না। মানুষের শ্রম কমে গেছে; কিন্তু দেখ জীবনীশক্তিও কমে গেছে। আগে সব জীবন ধারণ কোরবার জন্যে যে শ্রম দরকার হ'ত তা নিজেরাই করে নিত। এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে সব কিছু কোরতে পারে। তা দেখ বিজ্ঞান কিন্তু আসল বস্তুটি তৈরী কোরতে পারে না; এই ধর জল থেকে কত কিছু কোরছে কিন্তু জল তৈরী কোরতে পারে না, আবার মাটি থেকেও ধাতুদ্রব্য বেছে নিচ্ছে, অনেক ভাবেই তাকে রূপান্তরও কোরছে কিন্তু মাটি কোরতে পারে কি ? এখানেই বিজ্ঞানে হার

মান্তে হয়, কি বল ? এতে যেমন মানুষের সুখ-সুবিধে কোরছে, তেমন আবার ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে না পারলে বিপদও আছে।”

স্বামিজী—“আত্মা অনন্তকালই আছেন। তার সুখ-দুঃখ কিছুই নেই। আত্মা ভিন্ন আর সব বিষয়েতেই সুখ-দুঃখ আছে। তোমার মন যত সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম স্তরে উঠতে থাকবে, দুঃখও তত কমতে থাকবে। মনের নির্বিকার অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তোমার সুখ-দুঃখ থাকবেই। মনের নাশই হ'ল সুখ-দুঃখের নাশ। যতদিন তোমার শরীর আছে ততদিন সুখ-দুঃখও থাকবে। তার জন্যে ভাবনার কি আছে, বল ? আমাদের কি সুখ-দুঃখ নেই ? আছে। তবে আমরা ওটা সইবার জন্যে, চেষ্টা করে বিচার করে এখন সইতে পারি। কোন বিকার আসে না। আমি হিমালয়ে যখন ঘুরে বেড়াতুম এক একদিন খুব ক্ষিদে পেত অথচ খাবার নেই; তখন কি কোরতুম ? বিচার কোরতুম আর মন স্থির ক'রে ধ্যান আরম্ভ ক'রে দিতুম, কিছুক্ষণ এরূপ কোববার পর ক্ষিদে আর বোধ থাকতো না। ক্ষিদে, সুখ-দুঃখ এসব তো তোমার মনে হ'চ্ছে; মনকে স্থির ক'রে দাও ওসব আর বোধ থাকবে না। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ সব আছে।

২৯শে চৈত্র সোমবার ১৩৪৩ সাল, ১২ই এপ্রিল ১৯৩৭

স্বামিজী বলিতেছেন—“ভগবানের স্মরণ-মনন কর আর কাজ কর। তিনি সময়ে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিয়ে তোমাদের মুক্তি দেবেন। তাঁব প্রীতির জন্যেই কাজ। ভজনাদির দ্বারা যেমন তাঁর প্রীতি হয়, নিষ্কাম কর্মেতেও তেমনি হ'বে। আমি বোলছি ঠাকুর স্বামিজীর কাজই কাজ। তোমরা তাঁদের আদর্শ ক'রে চলবে; তাতে শান্তি পাবে। সন্ন্যাসী বা গৃহী, কাজে সকলেরই সমান অধিকার। ঠাকুর গৃহীদের আর সন্ন্যাসীদের কখনো পৃথক ভাবে ভাবতেন না।”

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

Ramkrishana Vedanta Society.
Calcutta. Feb. 21st. 1935.

স্নেহের শ—

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইলাম। তুমি কতদিন পূর্ব্বে আমার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলে? তোমার নাম খাতায় পাইতেছি না। তোমার মনে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে যে সন্দেহ উঠিয়াছে তাহা পত্র দ্বারা দূর করিতে পারা যায় না। তুমি যদি এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার তা হলে চেষ্টা করিতে পারি।

তোমার অস্তিত্ব যখন ব্যবহারিক জগতে তখন ব্যবহারিকতার মধ্য দিয়া পারমার্থিক সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। নেতি, নেতি জ্ঞান বিচারের পথ; উহা ভক্তির পথ নহে, ঐ পথের পথিক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী জ্ঞানী। তোমার পক্ষে ভক্তিমার্গই শ্রেয়ঃ। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সাকারের উপাসনা, জপ, ধ্যান করিতে হইবে। তৎপর জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে। বর্ত্তমানে "নেতি নেতি" করিও না, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা সর্ব্বদা করিবে।

তোমার গানের মধ্যে যেগুলি সাকারের সেইগুলি ভাল হইয়াছে। শান্ত মহারাজকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম সে তোমাকে স্মরণ করিতে পারিল না।

সমিতির সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

অভেদানন্দ

Ramakrishana Vedanta Ashrama.
Darjeeling. 1—8—1935.

স্নেহের শ—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমার পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়াছ। "আত্মজ্ঞান" যাহা Self knowledgeএর বঙ্গানুবাদ ছাপা হইয়া বেদান্ত সমিতি হইতে বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিবে। ইহাতে জ্ঞান-যোগের পন্থা স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। ইহা পাঠ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মানাত্ম বিচার করিবে ও আত্মার স্বরূপের ধ্যান করিবে।

প্রত্যহ অভ্যাস করিলে ধীরে ধীরে মন স্থির হইবে। মন স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেক তপস্যার আবশ্যক। "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মন স্থির করিবার উপায় এই বলিয়াছেন। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
অভেদানন্দ

The Ramkrishana Vedanta Ashrama.
Darjeeling. Nov. 24th. 1925.
Ruby Cottage.

স্নেহের ম—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তুমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে যখন ভক্তি কর, তখন তোমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে আমার আপত্তি কি হইতে পারে? আমার বোধ হয় বড় দিনের পূর্ব্বেই আমি কলিকাতায় নামিয়া যাইব। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আমাকে 40 Beadon Streetএ লিখিবে।

ইতিমধ্যে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়—নাম জপ করিবে, তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা করিবে এবং তাঁহার নিকট শুদ্ধা ও অচলা ভক্তি প্রার্থনা করিবে।

আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

অভেদানন্দ

The Ramkrishana Vedanta Society.
19B, Raja Rajkrishana Street.
Calcutta, Dec. 4th. 1935.

স্নেহের ম—

অনেক দিন পরে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

তোমার ধ্যানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির সঙ্গে মা কালীর মূর্ত্তি আসে ইহা খুব ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা কালী অভিন্ন জ্ঞানে ধ্যান করিবে। ৺ঠাকুরের ভিতর মা কালী আছেন। একাধারে দুই বিদ্যমান।

সমিতি ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ফাল্গুন মাসে শত বার্ষিকী উৎসবের দিন উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা আছে। আর্থিক সাহায্য প্রার্থনীয় জানিবে। সমিতির সমস্ত কুশল। বর্ত্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে।

শ্রীমায়ের উৎসবের নিমন্ত্রন কার্ড এই সঙ্গে পাঠাইলাম। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

অভেদানন্দ

The Ramkrishana Vedanta Ashrama.
Darjeeling, May. 18th. 1936.

স্নেহের ম—

বহুকাল পরে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র সহ ৫৲ টাকা পাইয়া প্রীত হইয়াছি এবং তোমাদের কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

প্রায় তিন সপ্তাহ হইতে চলিল আমি এখানে আসিয়াছি। কলিকাতায় ভীষণ গরমে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিল। এখানে আশ্রমের নির্জ্জনতা ও শীতল বায়ু ও বিশ্রাম ভোগ করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি।

তুমি যখন যে কাজে প্রবেশ কর তাহাতে তোমার যশোলাভ হয় শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। সংসারে আর্থিক কষ্ট সকলেরই ভোগ করিতে হয়। তোমাদের সাংসারিক অভাব যত বাড়িবে ততই আর্থিক উন্নতির দিকে চেষ্টা হইবে। অর্থ না থাকিলে ঋণ করিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে হইবে। ঋণগ্রস্ত হইলে অশান্তির সৃষ্টি হইবে। ইহাই সাংসারিক নিয়ম।

আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখাই শ্রেয়স্কর। ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত শান্তি ও আনন্দ Public works করিয়া পাওয়া যায় না। সেই জন্য নিয়ম করিয়া প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করিতে হইবে। Self-surrender and resignation to the will of the Lord করিলে শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়।

এই আশ্রমের সমস্ত কুশল এবং কার্য্য বেশ চলিতেছে। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং পরিবারের সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

অভেদানন্দ

The Ramkrishana Vedanta Society.
19B, Raja Rajkrishana Street.
Calcutta. 21—10—1936.

স্নেহের ম—

তোমার 2nd তারিখের পত্র যথাসময়ে এখানে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। আমি দার্জ্জিলিং হইতে 2nd Oct. রওনা হইয়া এখানে আসিয়াছি। জন্মোৎসব এখানে ও দার্জ্জিলিংএ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কীর্ত্তন, সভায় বক্তৃতাদি এবং রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ভূপেন বসুর কীর্ত্তন সমবেত নরনারীদিগকে আনন্দ দান করিয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার নরনারী প্রচুর প্রসাদ ভোজন তৃপ্তির সহিত করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে আমার পেটের গোলমাল সারিয়াছে এবং স্বাস্থ্য ভাল আছে। সমিতির সমস্ত কুশল।

করে জপের সুবিধা না থাকিলে মনে মনে জপ করিবে। ইহার উপকারিতা আছে। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

অভেদানন্দ

The Ramkrishana Vedanta Ashrama.
Darjeeling, July. 2nd. 1937.

স্নেহের ম—

তোমার 26th তারিখের ভক্তিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার পুত্রদ্বয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে যাহা প্রার্থনা করিবে তিনি তাহা নিশ্চয়ই পূরণ করিবেন। তিনি "কল্পতরু" সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। নিয়মিতভাবে জপ ধ্যান করিলে মনের চঞ্চলতা দূব হইবে এবং প্রাণে শান্তি পাইবে।

বর্ত্তমানে আমাব স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। এখন এখানে মধ্যে মধ্যে বৌদ্র ও Showers হইতেছে। বড় বর্ষা এখনো আরম্ভ হয় নাই। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং পরিবারের সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
অভেদানন্দ

Darjeeling.
June. 29th. 1934.

স্নেহের উপেন্দ্রনাথ

কমলার পত্রে তোমার সংবাদ পাইয়া তোমাকে লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইলাম। তোমার অসুখ কমিযাছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছ এবং তোমার পিতাও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন জানিয়া পরমানন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদিগকে কুশলে রাখুন এবং সর্ব্বতোভাবে তোমাদের মঙ্গল করুন। ডাক্তারবাবু, রবীন, শক্তিসুতবাবু প্রভৃতিকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবে।

কয়দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ পরিষ্কার ও সূর্য্যোদয় হইয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য অতি চমৎকার দেখিতেছি। গতকল্য আমার পেটের অসুখ হইয়াছিল। আজ ভাল আছি। আশ্রমের সমস্ত কুশল এবং কার্য্য বেশ চলিতেছে।

গত ৪ঠা জুন আমি নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গলাটের দরবারে গিয়াছিলাম এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া "যত মত তত পথ" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ভাবের উপদেশ শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি এখন কলিকাতায় গিয়াছেন। এখন হইতে 15th Aug. পর্য্যন্ত নূতন আইন যাহা এখানে জারী হইয়াছিল তাহা স্থগিত থাকিবে।

কলিকাতায় বোধহয় এখন বৃষ্টি হইয়া বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ ও ব্রঃ সদাশিব প্রভৃতির প্রীতি সম্ভাষণ জানিবে এবং বাড়ীর সকলকে জানাইবে। কমলা ও জগবন্ধুকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে তাহাদের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
অভেদানন্দ

পুঃ তোমার প্রথম পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।